দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

মার্কসবাদের ভোলবদল
বুদ্ধিজীবীর দাপটে
সর্বহারার নাভিশ্বাস
— পৃঃ ৩৫

কংগ্রেসের
ডি এন এ-র সন্ধানে
— পৃঃ ১১

৭১ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা।। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮।। ১৫ পৌষ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

কংগ্রেসের ধাপ্পাবাজি

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ১৬ সংখ্যা, ১৫ পৌষ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

৩১ ডিসেম্বর - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

ধর্মনিরপেক্ষীরা গৈরিকীকরণের ভূত দেখছে
□ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ৬

খোলা চিঠি : সুমন গ্রেফতার, সবাই চুপ কেন?
□ সুন্দর মৌলিক □ ৭

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থনীতি পরিচালনায় পূর্ণ স্বাধীনতার সীমারেখা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন □ বলবন্ত জয় পণ্ডা □ ৮

কংগ্রেসের ডি এন এ-র সন্ধানে □ প্রণব দত্ত মজুমদার □ ১১

বিচার ব্যবস্থাকে ভারতের সংস্কৃতি ও পরম্পরার বিষয়ে আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন □ বিশ্বনাথ বিশ্বাস □ ১৪

দেশের সোনা সরকারের অধীনে থাকা দরকার
□ অষ্টম কুমার মাঝি □ ১৬

বাংলাদেশে নির্বাচন আসে হিন্দুদের দুঃস্বপ্ন নিয়ে □ ১৮

কংগ্রেসের ইতিহাস শুধু মিথ্যাচার ও ভণ্ডামির
□ দেবযানী হালদার বসু □ ২৩

রাফাল নিয়ে সংসদে বিতর্কে কংগ্রেসের অনীহা— রাহুলের দলের আরেকটা ধাপ্পা □ চন্দ্রভানু ঘোষাল □ ২৬

শতাব্দীর কল্পতরু □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

কথামৃত ও কথামৃতকার শ্রীম : স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভাইদের দুর্দিনের প্রকৃত বন্ধু □ চিন্ময় সেনগুপ্ত □ ৩৩

মার্কসবাদের ভোলবদল — বুদ্ধিজীবীর দাপটে সর্বহারার নাভিশ্বাস □ অ্যান্টনি পি মুলার □ ৩৫

যোগীজীর কথায় বীর হনুমানের অপমান খুঁজে পেলেন যাঁরা হিন্দু বিদ্বেষী রাজনীতি করছেন □ প্রীতীশ তালুকদার □ ৩৭

পশ্চিমবঙ্গের দ্রুত পরিবর্তিত জনবিন্যাস : মুক্তি কোন পথে?
□ নীল ব্যানার্জি □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য: ২২** □ **সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** □ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** □ **চিত্রকথা : ৪০** □ **খেলা : ৪১**□ **অন্যরকম : ৪২** □ **স্মরণে : ৪৫** □ **সংবাদ প্রতিবেদন: ৪৬-৪৮** □ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৭ জানুয়ারি, ২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কংগ্রেসের শিখ নিধন

প্রকাশিত হবে ৭ জানুয়ারি, ২০১৯

১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর। শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দিল্লির শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষজনের উপর। ৩০০০ শিখ নিহত হলেন। রাজীব গান্ধী বলেছিলেন, 'বড়ো গাছ যখন মুখ থুবড়ে পড়ে, তখন তার চারপাশের মাটি এভাবেই কেঁপে ওঠে।' কংগ্রেসের শিখ নিধনের পাণ্ডাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এইচ কে এল ভগত, কমলনাথ, সজ্জনকুমার এবং জগদীশ টাইটলার। এদের মধ্যে কমলনাথ এখন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদীর জমানায় দিল্লি হাইকোর্ট সজ্জন কুমারকে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়েছে। বাকি দুজন ইহলোক ত্যাগ করেছেন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় কংগ্রেসের শিখ নিধন। লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাহুল গান্ধীর মিথ্যার বেসাতি

কংগ্রেস আবার তাহার মিথ্যার ঝাঁপি খুলিয়া বসিয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী বিগত কয়েকমাস যাবৎ 'রাফাল বিমান ক্রয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার দুর্নীতি করিয়াছে' এহেন অভিযোগ আনিয়া আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কোনও পাকাপোক্ত তথ্য প্রমাণ ছাড়াই তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে কুৎসিততম ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন 'দেশের চৌকিদারই চোর।' কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির এইসব অভিযোগ যে নিতান্তই মনগড়া, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাবমূর্তি কলুষিত করিবার একটি হীন এবং জঘন্য প্রয়াস—তাহা বুঝিতে এখন বিলম্ব হইতেছে না। দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়, সুপ্রিম কোর্ট রাফাল বিমান ক্রয়ে কোনওরকম অনিয়ম বা অনৈতিক কাজকর্মের প্রমাণ পায় নাই। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় সরকার নয়, রাফাল প্রসঙ্গে ক্রমাগত মিথ্যাচারণ করিতেছিলেন রাহুল গান্ধী স্বয়ং। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পরে অবশ্য বিভিন্ন মহল হইতে দাবি উঠিতেছে, কংগ্রেস সভাপতিকে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি ক্ষমা প্রার্থনায় নারাজ। দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিধান মানিতেও তিনি অনিচ্ছুক। সুপ্রিম কোর্টের চপেটাঘাত হজম করিয়া তিনি এখন যৌথ সংসদীয় কমিটির ধুয়া তুলিয়াছেন। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা লইয়া এই ধরনের অপরিণামদর্শী বালখিল্য আচরণ আগে কখনও প্রত্যক্ষ করা যায় নাই। রাফাল লইয়া এত লম্ফঝম্পের মাঝখানে কংগ্রেস সভাপতি বিস্মৃত হইয়াছেন যে, তিনি এবং তাঁহার মাতা সোনিয়া গান্ধী ন্যাশনাল হেরাল্ডের দুর্নীতির মামলায় জামিন লইয়া দিন কাটাইতেছেন। অনেকেই বলেন, ন্যাশনাল হেরাল্ডের দুর্নীতিটি আড়াল করিতেই রাফাল লইয়া মিথ্যার বেসাতি ফাঁদিয়া বসিয়াছেন রাহুল গান্ধী।

কংগ্রেসের আর একটি মিথ্যার বেসাতি হইল কৃষিঋণ মকুব। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে ক্ষমতায় আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ঋণ মকুব করিয়াছে কংগ্রেস। রাহুল গান্ধী বলিয়াছেন, 'আমরা দুই দিনের ভিতরই ঋণ মকুব করিয়া দিয়াছি।' কিন্তু ঋণ মকুবের এই ধাপ্পাবাজিটি করিতে গিয়া কংগ্রেস সত্যটিকে গোপন করিতেছে। প্রথমত, সমস্ত কৃষকের ঋণ কংগ্রেস মকুব করে নাই। যাহাদের তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ রহিয়াছে, তাহাদেরই ঋণ মকুব করা হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেসের এই ধাপ্পাবাজির রাজনীতির ভিতর একটি অশনি সংকেত দেখিতেছেন দেশের অগ্রগণ্য অর্থনীতিবিদেরা। অর্থনীতিবিদদের যুক্তি হইল—ঋণ মকুবে গরিব কৃষকের কোনও লাভ হইবে না, বরং দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অর্থনীতিবিদদের প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী দেশের চার ভাগের মধ্যে তিন ভাগ চাষিই ব্যাংক ঋণ পান না। তাহা জোটে ধনী চাষিদের কপালে। ফলে, ধনী চাষিরাই ঋণের টাকা ফাঁকি দিবার অবাধ সুযোগ পাইয়া যাইবে। উপরন্তু, ঋণ মকুব করিতে গিয়া পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সরকারের অর্থ সংকট দেখা দিবে। অর্থনীতিবিদদের আরও আশঙ্কা, এতে ঋণ ফাঁকি দিবার মনোবৃত্তি আরও বাড়িবে। ব্যাংকগুলিও সংকটে পড়িবে।

দেশের অর্থনীতির এই সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী এবং তাঁহার পারিষদদের কোনও হেলদোল নাই। মিথ্যার উপর ভর করিয়া তাঁহারা রাজনীতি করিতে নামিয়াছেন, দেশ রসাতলে গেলেও তাঁহাদের কিছু যায় আসে না। তবে ভবিষ্যতে এই মিথ্যার বেলুনটি চুপসাইয়া গেলে কোথায় মুখ লুকাইবেন, তাহাও যেন রাহুল গান্ধী ভাবিয়া রাখেন।

সুভাষিতম্

মৃদুনৈব মৃদুং হন্তি মৃদুনা হন্তি দারুণম্।
নাসাধ্যং মৃদুনা কিঞ্চিৎ তস্মাৎ তীক্ষ্ণতরো মৃদুঃ।। (চাণক্যনীতি)

সহজ উপায়েই সামান্য বিঘ্ন বিনষ্ট হয়। আবার সেই সহজ উপায়েই দারুণ ব্যাঘাতও দূরীভূত হয়। কোমলতার কাছে কোনো কিছুই অসাধ্য নয়। সুতরাং কোমলতাকেই সুতীক্ষ্ণ উপায় বলে গণ্য করা উচিত।

ধর্মনিরপেক্ষীরা গৈরিকীকরণের ভূত দেখছে

মণীন্দ্রনাথ সাহা

ধর্মনিরপেক্ষী নামে স্বাধীন ভারতে এক সংকর জাতের সৃষ্টি হয়েছে— এরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। এরা হলুদ বা গেরুয়া রঙের নাম শুনলে খেপে ওঠে। গেরুয়া রঙ দেখলে কেঁদে ওঠে। এদের এই খ্যাপামি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে স্বপ্নেও এরা সাফ্রন সাফ্রন বলে চেঁচিয়ে ওঠে।

খেপা পরশপাথর খুঁজে মরে। খেপা বাউল সনানন্দে গান গেয়ে বেড়ায়। গানে মানুষ মুগ্ধ হয়। কিন্তু খেপা ষাঁড় যাকে তাকে গুঁতায়। এদেশের খেপা ধর্মনিরপেক্ষীরা খেপা ষাঁড়ের স্বভাব ধরেছে। ভাগ্যিস এদের শিং নেই, তাই বাঁচোয়া। নইলে হিন্দুত্ববাদীদের গুঁতিয়েই এফোঁড়-ওফোঁড় করে ছাড়ত। যদিও এদের দাঁত আছে। খিঁচানোর জন্য, কিন্তু দংশনের পক্ষে ততটা সুবিধের নয়। ফলে প্রকৃতি এদের মুখে দিয়েছে গরল আর হাতের কলমের ডগায় দিয়েছে কর্দম ছিটাবার শক্তি। গরল উদ্গীরণ ও কর্দম ছিটাতে এদের জুড়ি, নেই। কারণ, এরা অনেকে তৈলসিক্ত আরবীয় ডলারের বলে বলীয়ান।

'স্কুলে গৈরিকীকরণ রুখতে আই সি এস ই কর্তার সঙ্গে বৈঠকে বসছেন পার্থ' শীর্ষক খবরে জানা গেল— 'রাজ্যের স্কুলগুলিতে নাকি হাত বাড়াচ্ছে আর এস এস। পাঠ্যসূচিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাম্প্রদয়িকতা, দ্বিজাতিতত্ত্ব। তাই এবার সব বেসরকারি স্কুলকে স্ক্যানারে আনছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর।' তবে শিক্ষা দপ্তর কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিশ ছড়ানো, সন্ত্রাসী তৈরির কারখানা স্বরূপ বেসরকারি মাদ্রাসার কথা বলেনি।

সম্প্রতি উত্তরদিনাজপুর জেলার দারিভিট হাইস্কুলের শিক্ষক নিয়োগকে ঘিরে দুই ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। এই ঘটনার দায় সরাসরি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উপর চাপিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

চালুনি বলে সূঁচ তোর পেছনে ক্যান ছেঁদা— একটা লোকপ্রচলিত কথা। একথা পশ্চিমবঙ্গের অতীত ও বর্তমান সরকারের প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অতীতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার সর্বাঙ্গ লালে লাল করা হয়েছিল। অতিরিক্ত লালিকরণের ঠেলায় ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সবার মুখে লালা ঝরেছে। সে লাল রক্তমিশ্রিত। শিক্ষায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পশ্চিমবঙ্গকে তারা সপ্তদশ স্থানে প্রমোশন দিয়ে গৈরিকীকরণের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিল। তাদের মুখেই জনগণ লালা ছিটিয়েছে।

অতীত অতীত হওয়ার পর বর্তমানের শুরু থেকে ওই একই রকমের শিক্ষাব্যবস্থা চলে আসছে। কলেজে কলেজে টিচার্সরুমে ঢুকে শিক্ষকদের মারধর করে, শিক্ষকদের ঘেরাও করে রাখে, শাসক দলের সম্পাদকেরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাকে জগ ছুঁড়ে মারে। এই যদি বর্তমান শিক্ষানীতি হয় তবে তো রাজ্যের শিক্ষার মান মার্কসবাদীদের উন্নীত করা সপ্তদশ স্থন থেকে আরও প্রমেশন পেয়ে সপ্তবিংশতিতম স্থানে পৌঁছবে। কিন্তু ওই যে কথায় বলে লজ্জাহীনে লজ্জা দিবে কেবা। এদের কার্যকলাপে লজ্জাও লজ্জায় মুখ লুকাচ্ছে।

যাঁরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গৈরিকীকরণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছেন তাঁরাই কিন্তু সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রমে পুরোদমে ইসলামিকরণের তোড়জোড় শুরু করেছেন। যেমন— রামধনুর পরিবর্তে রংধনু, বাবা-মা-র বদলে আব্বা-আম্মা, মাসিমার জায়গায় খালা আম্মা ইত্যাদি কোমলমতি শিশুদের মগজে ঢুকাচ্ছেন। আর কিছুদিনের মধ্যে হয়তো— এক-এ চন্দ্রের বদলে এক-এ আল্লা, অ-এ অজগর আসছে তেড়ে'র পরিবর্তে অজুকরে নমাজ পড়ো, আ-এ আমটি আমি খাব পেড়ে'র জায়গায় আল্লা বড়ো দয়ালু ইত্যাদি পড়ে আমাদের ঘরের শিশুরা শিক্ষিত হয়ে উঠবে। এর পরেও যদি হিন্দুদের ঘুম না ভাঙে তাহলে যখন তাদের ঘুম ভাঙবে তখন আর করার কিছুই থাকবে না।

লালমার্কা বুদ্ধদেববাবু মাদ্রাসার বিরুদ্ধে একবার মুখ ফসকে সত্য কথা বলেছিলেন। কথাটা হলো, মাদ্রাসাগুলিতে সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁকে ঢোক গিলতে হয়। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই দশ হাজার খারিজি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যেখানে হিন্দু নিকেষ আর পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবাংলাদেশ বানানো বা জেহাদ করার পাঠ দেওয়া হলেও সরকার চুপ থাকে, কিন্তু আর এস এসকে গালি দেয়। রামনবমীর মিছিলে, রথযাত্রায়, দুর্গাপূজার বিসর্জনে সর্বত্রই এরা আর এস এস-এর ভূত দেখে। কিন্তু গোটা রাজ্য যে ইসলামি সন্ত্রাসীতে ভরে গেছে, যেখানে সেখানে হিন্দুদের ঘরবাড়ি লুটপাট, নারী নির্যাতন, অগ্নি সংযোগ কারে পথে বসাচ্ছে, এমনকী কালিয়াচক থানা আক্রমণ করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে তোমাদের সরকার নপুংসক সরকার। এ সমস্ত এরা দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না। কেননা এই না দেখা বা না শোনা নাকি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার চাবিকাঠি। ■

সুমন গ্রেপ্তার, সবাই চুপ কেন?

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হয়ে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হন কলকাতার একটি বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদক সুমন চট্টোপাধ্যায়। আইকোর চিটফান্ড সংস্থার থেকে বেআইনি ভাবে টাকা নিয়েছিলেন তিনি। এর আগে বেশ কয়েক বার তাঁকে সিবিআই জেরা করেছে।

সারদা কাণ্ডে আগেও সুমনবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে সিবিআই এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ডেকে পাঠিয়ে জেরা করেছে। অভিযোগ, সারদা গ্রুপ থেকে ৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিলেন সুমনবাবু। সেই টাকা ফেরত দিতে তিনি ফের দুটি চিট ফান্ড সংস্থা থেকে টাকা ধার নেন। বুঝেছেন কাণ্ড!

সিবিআইয়ের অভিযোগ, আইকোর সংস্থা বেআইনি ভাবে সাধারণের থেকে যে টাকা তুলেছিল, সেই টাকা সুমন চট্টোপাধ্যায়ের মালিকানাধীন সংস্থা দিশা প্রোডাকশন্স অ্যান্ড মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছিল। সুমনবাবুর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টেও বেআইনি ভাবে টাকা রাখা হয়েছিল। আইকোর গ্রুপের সিইও অনুকূল মাইতি ও তাঁর স্ত্রীকে আগেই গ্রেপ্তার করেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশ। এবার সুমনবাবু।

গ্রেপ্তারের দিনে প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য কলকাতার সিবিআই দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সেখানেই দীর্ঘক্ষণ জেরা করার পরে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সিবিআই তাঁকে ভুবনেশ্বর নিয়ে গিয়েছে। চলছে জেরা।

এই খবর টুকটাক ওয়েব মিডিয়ায় বের হলেও দৈনিক পত্রিকা, টিভিতে নেই। কেন? প্রথম কথা দিদি বারণ করেছেন। দ্বিতীয় কথা, বাকি সব মিডিয়ার গোপন কথাও জানেন সুমন।

দ্বিতীয় কারণটা বোঝা যায়। কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হয়ে যাক সেটা কেউ চান না। কিন্তু দিদি কেন বারণ করলেন! কেন গ্রেপ্তারের পরে পরেই দিদির পক্ষ থেকে সব মিডিয়া হাউজে ফোন এল!

সেই কারণটা রয়েছে আদালতে। আগামী দু'মসের মধ্যে দুই রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে নারদ স্টিং অপারেশনের ফুটেজ 'খাঁটি' ছিল কিনা। রিপোর্ট বলে দেবে, লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেস মারাত্মক চাপে পড়তে চলেছে কি না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গাঁধীনগর থেকে এই দু'টি রিপোর্ট দু' মাসের মধ্যে চলে আসবে। ইতিমধ্যেই সেই খবর কলকাতা হাইকোর্টকে জানিয়েছে সিবিআই। এছাড়া সিবিআই নারদ তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট মুখবন্ধ খামে আদালতে পেশ করে।

সবাই জানেন, এ রাজ্যের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং একজন আইপিএস অফিসারের কাছে গিয়ে স্টিং অপারেশন চালিয়েছিলেন সাংবাদিক ম্যাথু স্যামুয়েল। সেখানে তৃণমূলের একাধিক নেতা, মন্ত্রী, সাংসদকে টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল। গত বিধানসভা ভোটের মুখে এই ফুটেজ প্রকাশ্যে আসায় রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই নারদ তদন্তভার হাতে নেয়। সিবিআই-এর দায়ের করা এফ আই আর-এ তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, ইকবাল আহমেদ-সহ ১৩ জনের নাম ছিল। সেসব ফাইল এখন শুধু খোলার অপেক্ষা।

সত্যিই ভয়ে আছেন তৃণমূলনেত্রী। আইকোর থেকে গোরুপাচার সবেতেই যে তাঁর ভাইপো রত্নটি জড়িত। আসলে সুমনকে গ্রেপ্তার মানে একটা ইঙ্গিত। দিদি সেটা ভালোই বুঝেছেন। জড়িত অনেক অনেক ভাই।

সেই ভাইদের অনেকেই আবার মিডিয়ার কর্তা।

— **সুন্দর মৌলিক**

অতিথি কলম

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থনীতি পরিচালনায় পূর্ণ স্বাধীনতার সীমারেখা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন

বলবন্ত জয় পণ্ডা

দু'বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে তিন তিন জন গভর্নরের নিযুক্তি ঘটায় নাগরিক মহলে শীর্ষ ব্যাঙ্কের স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্ক দানা পাকাচ্ছে। এ বিষয়ে সুস্থ বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। অবশ্যই তা দলকেন্দ্রিক একপেশে যেন না হয়ে পড়ে। এই সূত্রে শীর্ষ ব্যাঙ্কের অতীত ইতিহাস ও সেই সুবাদে আমাদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

অবিশ্বাস্য মনে হলেও ঘটনা এই যে আধুনিক যুগের রাজনীতি, শাসনব্যবস্থা এমনকী অর্থনীতি পরিচালনার ধারার সঙ্গে সহস্র সহস্র বছরের অতীত রোমান ইতিহাস বা ভারতের মৌর্য সম্রাটদের সমৃদ্ধ অর্থনীতির সাযুজ্য প্রায়সই পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রসঙ্গটি ভিন্ন। বাস্তবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জন্মকাল নিতান্তই আধুনিক যুগের ভাবনা-প্রসূত। এর পেছনে কোনও অতীত প্রজ্ঞার অস্তিত্ব নেই। বিশ্বে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রথম স্থাপনা হয় সুইডেনে ৩৫০ বছর আগে। এর পরই বিশ্ববিখ্যাত ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ড তৈরি হয় ১৭৯১ সালে। এর কিন্তু মূলত কাজ ছিল সরকারকে টাকা ঋণ দেওয়া আর সরকারের দেওয়া ঋণ কিনে নেওয়া। মার্কিনদেশ ও ফ্রান্সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তৈরি হতে দেরি হয়নি।

এই ব্যাঙ্কিং প্রণালী গড়ে ওঠার আগে বড় বড় ধনীরাই সরকারকে তাদের দরকার মতো অর্থের যোগান দিত। উদাহরণ স্বরূপ প্রসিদ্ধ রথচাইল্ড পরিবারের কথা বলা যায় (এই পরিবারেই অর্মত্য সেন তৃতীয়বার বিবাহ করেন)। এঁরা ইউরোপের তদানীন্তন অধিকাংশ সরকারের কাছেই টাকা জমাত।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে এই ব্যাঙ্কগুলির রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভূমিকা কী হওয়া উচিত তাই নিয়ে সময়ের বদলের সঙ্গে সঙ্গে নানান তর্কবিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে। তবে বিগত চার দশক ধরে প্রধানত দুটি বিষয়কে নিয়ে তীব্র চাপান-উতোর চলছে। দু'টি বিষয়ই ভীষণভাবে এই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রথমত হলো সরকারের হস্তক্ষেপ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার স্বাধীন সত্তা কতদূর টিকিয়ে রাখতে পারে। দ্বিতীয়ত, দেশে মুদ্রাস্ফীতিকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। প্রায়শই মুদ্রাস্ফীতিকে বশে রাখতে খরচে লাগাম টানার নিদান দেওয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে সরকারের ঢালাওভাবে খরচ করার প্রবণতা নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত হয়। দেখা গেছে এ বিষয়ে পারদর্শীরা অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতির স্বপক্ষেই তাঁদের রায় দিয়েছেন, আবার অনেকে এর যুক্তিযুক্ততা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন। ভূতপূর্ব মার্কিন ট্রেজারি অধিকর্তা এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ''সম্পূর্ণ স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট যখন দক্ষতার পরিচয় দেয়, কেননা দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির উত্তাপ থেকে দূরে ও বিচ্ছিন্ন থাকায় তারা দীর্ঘমেয়াদি কিন্তু জনতার দরবারে অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হয় না।''

এরই বিপরীতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ্ জোসেফ স্টিগলিজ যুক্তি দিয়েছেন, যে সমস্ত দেশে অর্থনীতি সম্পূর্ণ স্বাধীন, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্ভর, তারা কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক বিপদের সময় বহুক্ষেত্রেই ব্যর্থ হওয়ার নজির রেখেছে। একটু জটিল হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কীভাবে দেশের আইন প্রণেতাদের টেক্কা দিয়ে চলে যায় তার উদাহরণটি দেওয়া দরকার। সম্পূর্ণ স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় বাজারে চালু থাকা সরকারি ঋণপত্র (বন্ড) কেনা শুরু করে প্রায়শই অর্থনীতিতে নতুন অর্থের যোগান ইচ্ছেমতো চালু করে দেয়। এই কাজটা কখন কীভাবে, কী পরিমাণে করতে হবে তা কিন্তু নির্বাচিত সরকাররেরই অধীনে কাজ। এই ভাবে সরকারের নির্দিষ্ট অধিকারে যত বেশি হস্তক্ষেপ ঘটে ও তার প্রতিক্রিয়ায় অবশ্যম্ভাবী রাজনীতিরও অনুপ্রবেশ ঘটে যায় (সরকার তার ভূমিকা কাট-ছাঁট হওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়)।

যে সমস্ত দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সেখানে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে এই দড়ি টানাটানি বড় সমস্যা তৈরি করে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার জনতার কাছে তার দায়বদ্ধতার কতটা অংশ একটি নির্মোহ দৃষ্টিতে, সব ঠাণ্ডা মাথায়, নিজস্ব পুঁথিগত বিদ্যাবলে নেওয়া ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিস্পৃহ থাকলে সেটা মহা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা জনপ্রিয় সরকারের প্রায়শই জনতার মঙ্গলে অর্থনীতিগতভাবে সঠিক নয় কেবলমাত্র জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রায়শই ভুল সিদ্ধান্ত নেয়? হ্যাঁ, মাঝে মধ্যেই তারা তা করে থাকে। ঠিক তেমনি দায়বদ্ধতাহীন, অনির্বাচিত কিছু অর্থনৈতিক প্রযুক্তিবিদরা কি ভুলের ঊর্ধ্বে? না, তা মোটেই নয়। তাঁরাও প্রায়শই ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। এ বিষয়ে আরও বিশদে যাওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রায়শই চূড়ান্ত বৈপরীত্যে ভরা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে যা কিছুতেই নজরে এড়ায় না।

এই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টাই এমন যেন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একমাত্র পাখির চোখ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ বিশ্ব অর্থনীতির গতিবিধি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে 'মুদ্রাস্ফীতি' সদা সর্বদাই অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। এটি কিছু কিছু কার্যকারণের ভিত্তিতেই ঘটে থাকে। মার্কিন ও ব্রিটিশ অর্থনীতির ক্ষেত্রে ৭০ এর দশকে বড় ধরনের মন্দা দেখা দিয়েছিল। অর্থনীতি থমকে দাঁড়িয়েছিল, মুদ্রাস্ফীতি হু হু করে বাড়ছিল। পণ্ডিতরা বলেন এর মূলে ছিল মহাপণ্ডিত অর্থনীতিবিদ কেইন্স-এর সূত্রের অন্ধ অনুসরণ। বাড়তি বলা হলেও বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে কেইন্স-এর কিন্তু অর্থনীতিতে কোনও প্রথাগত ডিগ্রি ছিল না। তাহলে দেখা গেল নির্দিষ্ট কোনও নীতির পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে অনুসরণের ফলেই মুদ্রাস্ফীতি বস্তুটির উদ্ভব ঘটে। বিগত শতাব্দীর মুখ্য অর্থনীতিবিদ কেইন্স-এর নীতি অনুসারে দেশের করহার উঁচু মাত্রায় বেঁধে রাখা ও অপরিমিত সরকারি ব্যয়ের ফলেই বিশ্বখ্যাত একটি সন্ধির জন্ম হয়। অর্থনীতির থমকে থাকা বা stagflation + মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে থাকে। ইউরোপ আমেরিকার নাগরিকরা এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পেতে রক্ষণশীল বলে খ্যাত রিপাবলিকান রোনাল্ড রেগ্যান এবং ব্রিটেনে রক্ষণশীল দলের মার্গারেট থ্যাচারকে ক্ষমতায় আনে। ৮০-র দশকে এই দু'জনেই তাঁদের দলীয় নীতি অনুযায়ী কঠিন ও বাস্তবানুগ সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেননি। তাঁরাই এই লাগাম ছাড়া মুদ্রাস্ফীতি রুখতে তাঁদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে বিশেষভাবে সুদের হার বৃদ্ধি, সরকারি খরচে কাট-ছাঁট বা করের হার কমানোর মতো সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নির্দেশ দেন যাতে মুদ্রাস্ফীতিতে ভাটা পড়ে। তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে কোনও মূল্যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ না করলে সরকার নীরব দর্শক হয়ে থাকে না এটা পরিষ্কার হলো।

বিশ্ব অর্থনীতিতে এর পর আরও জল গড়িয়ে গেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির স্বাধীনতা খর্ব

> **নবনিযুক্ত আর বি আই গভর্নর শ্রী শক্তিকান্ত দাস তাঁর কাজে কতখানি সফল হবেন তা কেবল সময়ই বলতে পারবে। তবে তিনি কঠিন বা জনপ্রিয় হবে না এমন সিদ্ধান্ত সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বা স্বাধীনভাবেও নিতে পারেন। কিন্তু সরকারের কাছে পরিস্থিতির দাবিতে স্বল্পমেয়াদি বা মধ্য মেয়াদি কোনও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যদি একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে তাঁকে কিন্তু অবশ্যই খোলা মনে পারস্পরিক (সরকারের সঙ্গে) ভারসাম্য বজায় রেখেই কাজ করতে হবে।**

করা নিয়ে শোরগোল দেখা দিয়েছে। আর এই প্রক্রিয়ার শুরু হয়েছিল ২০০৮-এর মার্কিন অর্থনীতির পতনে। কুখ্যাত রিয়েল এস্টেট কেলেঙ্কারি ভ্রান্ত সুদ নীতির অনুসরণেই অর্থনীতিতে ধস নামে যার আঁচ সারা বিশ্বে পৌঁছেছিল। ফলস্বরূপ, মার্কিন পুঁজির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান প্রবাদপ্রতিম অ্যালান গ্রিনস্‌প্যান যিনি আবার মহাশক্তিধর সংস্থা মার্কিন federal reserve এর দু'দশক ধরে অধিকর্তা ছিলেন তিনি অভিযুক্ত হন। তাঁকে ব্যাঙ্কের সুদের হার অস্বাভাবিক রকম কম রাখার কারণেই যে বিশাল গৃহ ঋণ কেলেঙ্কারি ঘটতে পেরেছিল সেই অভিযোগে সরাসরি অভিযুক্ত করা হয়। Federal আদালতে শুনানির সময় তিনি তা মেনেও নেন। অর্থনৈতিক পণ্ডিতরাও যে ভুল করে থাকেন তা বোঝা গেল।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের আর বি আই আবার উল্টো পথে হাঁটার অপরাধ করছে। মূদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার উপর্যুপরি ভুল ভবিষ্যদ্‌বাণী করে তাঁরা বাজারে সুদের হার (যে হারে শিল্পকে ঋণ নেওয়া হবে) বাড়িয়ে রেখেছেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে একটি অগ্রসরমান অর্থনীতিতে শিল্পপতিদের হাতে টাকার টান পড়ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানালে আদৌ অস্বাভাবিক বা অশ্রুতপূর্ব বলে মনে হয় না। উন্নত দেশগুলিতে এ চেষ্টা নিরন্তর চলছে। নবনিযুক্ত আর বি আই গভর্নর শ্রী শক্তিকান্ত দাস তাঁর কাজে কতখানি সফল হবেন তা কেবল সময়ই বলতে পারবে। তবে তিনি কঠিন বা জনপ্রিয় হবে না এমন সিদ্ধান্ত সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বা স্বাধীনভাবেও নিতে পারেন। কিন্তু সরকারের কাছে পরিস্থিতির দাবিতে স্বল্পমেয়াদি বা মধ্য মেয়াদি কোনও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যদি একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে তাঁকে কিন্তু অবশ্যই খোলা মনে পারস্পরিক (সরকারের সঙ্গে) ভারসাম্য বজায় রেখেই কাজ করতে হবে।

একটি গোষ্ঠী যেটা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ধরে নিচ্ছে যে, চলতি সরকারের আমলে কাজ করা আমলা মানেই বশংবদ হবেন, তা ঠিক নয়। পূর্বতন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নর ওয়াই ভি রেড্ডি বা সুব্বা রাও তাঁদের কর্মজীবন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও আজও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। ভাবলে স্তম্ভিত হতে হবে পূর্বোল্লখিত নোবেল জয়ী জোসেফ স্টিগলিজ অকপটে বলেছেন যে রেড্ডি মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নর থাকলে ওই ভয়ঙ্কর মার্কিনি মন্দা আদৌ অর্থনীতিতে থাকত না।

(লেখক রাজ্যসভার পূর্বতন সাংসদ)

রম্যরচনা

ভারতের নয় কেউ

তিনমূল বলে তারা তৃণমূল নয়—
মূল যার তিনটি হেথা-হোথা রয়।
প্রথম মূলটি তার আছে কলকাতাতে,
দ্বিতীয় মূলের খোঁজ পাবে গিয়ে ঢাকাতে,
তৃতীয় মূলের তরে যাও সোজা আরবে—
মূল সুর বাঁধা যেথা ওড়ব ও খাড়বে।
পশ্চিমবঙ্গ না, নাম চায় বাংলা,
তাই শুনে হয়রান আমাদের ভ্যাবলা।
বলে কেন বাজছে না ভারতের সুরেতে—
খুঁজে খুঁজে হয়রান কাছে কিবা দূরেতে।
কারণ না পায় কোনও তাই শুধু গোনে ঢেউ—
বিশ্ব বাংলা তারা ভারতের নয় কেউ।

উবাচ

“আপনারা যদি রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ন দেখতে চান, তাহলে আপনাদের সুনিশ্চিত করতে হবে যেন ‘ক্যাশ ফর ভোট’ অভ্যাসের পুরোপুরি অবসান ঘটানো যায়।”

পেমা খাণ্ডু
মুখ্যমন্ত্রী,
অরুণাচলপ্রদেশ

মারিয়াংয়ে এক জনসভায় বক্তব্যে

“ক্ষমতা ছাড়া কিছু মানুষ এক মুহূর্তও বাঁচতে পারেন না। এ যেন তাদের কাছে অক্সিজেন।”

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

একশো টাকার মুদ্রা উদ্বোধনের সময় বক্তব্যে

“অধ্যাপকদের এমনভাবে নিজেদের পেশ করা উচিত যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যাপকদের নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।”

কেশরীনাথ ত্রিপাঠী
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বক্তব্যে

“শঙ্করজী বা মহাদেবকে নিয়ে শুরু করেছেন রাহুলজী, এবার রামে এসে শেষ করুন। রামমন্দির নির্মাণে এগিয়ে আসুন।”

উমা ভারতী
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

একটি সংবাদপত্রের সাক্ষাৎকারে

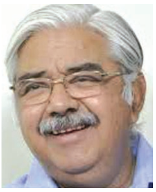

“অভিজ্ঞতা থেকে বলছি সুপ্রিম কোর্টের ওপর খুব বেশি ভরসা নেই। তারা প্রতিদিন রামমন্দিরের শুনানি করবেন, এমনটা জোর গলায় বলতে পারছি না।”

অলোক কুমার
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের
কেন্দ্রীয় কার্যকর্তা

জানুয়ারিতে শীর্ষ আদালতের রামমন্দির শুনানি প্রসঙ্গে

কংগ্রেসের 'ডি এন এ'র সন্ধানে

প্রণব দত্ত মজুমদার

কংগ্রেস দলটির নেতাদের আচার আচরণ বিশ্লেষণ করলে যে উপলব্ধি হয় তা হলো— নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিজের দেশের স্বার্থকেও তাঁরা বলি দিতে পারেন, দেশের গরিমাকে তারা নষ্ট করতে দ্বিধা করেন না। দেশের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হারানোর জন্য দরকার হলে বিদেশি শত্রুর সাহায্য নিতেও তাদের কুণ্ঠা হয় না। একটা জাতীয় দল এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো আচরণ করে কী করে?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে কংগ্রেস দলটির গোড়াপত্তনের ইতিহাস একটু জানতে হবে। একটি রাজনৈতিক দলের গোড়াপত্তনের ইতিহাস তার ডি এন এ বুঝতে সাহায্য করে। আসলে নিজের স্বার্থের জন্য বিদেশিশক্তির খিদমতগিরি করার ওই অভ্যাসটা কংগ্রেসের ডি এন এ-র মধ্যেই আছে যেটা সে জন্মসূত্রে লাভ করেছে। যাঁরা ইতিহাস নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন না তারা ভাবতে পারেন কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে ভারতের স্বাধীনতা আদায়ের জন্য। আসল ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম দিয়েছিলেন অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম নামে এক সাহেব। পরে অবশ্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ভারতীয় সভাপতি হন। মি. হিউম কী উদ্দেশ্য নিয়ে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' তৈরি করেছেন তা ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে জানাতে গিয়ে বলেছিলেন— "It (Indian National Congress) is the Safety Valve of the British empire in India". অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'সেফটি ভাল্ব' হিসাবে ভারতে কাজ করবে।

সেফটি ভাল্বের কাজ হলো সিস্টেম চেম্বার (বয়লার, প্রেসারকুকার ইত্যাদি)-এর ভেতরের মাত্রাতিরিক্ত চাপকে বাইরে বার করে দিয়ে এটিকে বাস্ট করা থেকে রক্ষা করা। তেমনি ইংরেজের অপশাসনের ফলে এদেশের জনসাধারণের মধ্যে যখন ক্ষোভবিক্ষোভের সঞ্চার হবে তখন এই ক্ষোভবিক্ষোভের মাত্রাতিরিক্ত চাপ কংগ্রেস নামক 'সেফটি ভাল্ব'-এর মাধ্যমে কৌশলে নির্গত করে দেওয়া হবে যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ফাটল না ধরে। দেশের আপামর জনসাধারণের স্বার্থে নয়, ইংরেজ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষকে পদানত করে রাখতে পারে সেই কারণে কুটিল রাজনৈতিক অপকৌশল চরিতার্থ করার জন্যই কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল। কাজেই দেশবাসীর সঙ্গে তঞ্চকতা করার ডি এন এ নিয়েই কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল।

স্যার অকল্যান্ড কলভিনকে লেখা মি. হিউমের পত্র থেকে জানা যায় ব্রিটিশের অপশাসনে বিশেষ করে— অত্যাচারী দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ, কঠোর রাজস্ব সংগ্রহ নীতি, অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বিচার ব্যাবস্থা, ইংরেজদের লুণ্ঠন, উৎপীড়ন শোষণের ফলে দেশের লোকের মধ্যে অসম্ভব দারিদ্র্য ও হতাশার সঞ্চার হচ্ছে, ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে। তার ফলে সিপাহি বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীলকর বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি দিকে দিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।। এই সব পর্যালোচনা করে তিনি উপলব্ধি করেন— এইসব ক্ষোভ-বিক্ষোভের অতিরিক্ত চাপকে নির্গত হওয়ার কৌশলী রাস্তা না বানালে সারা ভারত জুড়ে ব্যাপক বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠলে তাকে সামলানো ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে মুশকিল হবে। তাই মি. হিউম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তৈরি করেন— ভারতবাসীর শক্তি, সাহস, উদ্দম, প্রেরণা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ ইত্যাদিকে কৌশলী পথে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ১৮৮৫ সাল থেকে গান্ধীজীর আগমন (১৯১৫)

ব্রিটিশ কীসের ভয়ে তড়িঘড়ি ভারতের স্বাধীনতা দেওয়া মনস্থ করেছিল এবং ১৯৪৭ সালে ভারত ছেড়ে চলে গেল? সে কি গান্ধীজী ও কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের ভয়ে? না কি অন্য ভয়? কী সেই ইতিহাস? আসলে কংগ্রেসের পুরো ইতিহাসটাই ভণ্ডামির। আজও দেশবাসীর সঙ্গে ভণ্ডামিই করে চলেছে তারা।

পর্যন্ত কংগ্রেসের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল না। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু অভিজাত ব্যক্তি কোনও নির্দিষ্ট দিনে কোনও নির্দিষ্ট স্থানে ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসতেন এবং বিনীত ভাবে এদেশীয়দের জন্য কিছু দাবি- দাওয়া পেশ করতেন, তারপর আমোদ-আহ্লাদ করতেন। স্বাধীনতার দাবি তাঁরা কল্পনাও করতেন না।

চিত্রটা একটু পালটাতে আরম্ভ করল ১৯০৫ সাল থেকে, কার্জনের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলার বুকে তীব্র স্বদেশি আন্দোলনের সূত্রপাত হলে। ক্রমে ক্রমে স্বদেশচেতনা তীব্র জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। সারা দেশ জুড়ে বহু গোপন বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠল যারা বোমা মেরে গুলি করে ইংরেজ শাসকদের এদেশ থেকে তাড়াতে চাইল। সেসব ইতিহাস আমাদের অল্পবিস্তর জানা আছে। ইংরেজ বাধ্য হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ রদ করতে। তাঁরা অধিকতর নিরাপত্তার স্বার্থে রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে দিল্লি নিয়ে যায় ১৯১১ সালে। কিন্তু বিপ্লবীরা তাঁর উপরেও বোমা ছুঁড়েছিল। অল্পের জন্য বেঁচে যান বড়লাট।

কংগ্রেসের মধ্যেও কিছু চরমপন্থী নেতা উঠে এলেন— তাঁরা আবেদন নিবেদনের গতানুগতিক রাস্তা থেকে সরে এসে ইংরেজের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইলেন। ক্রমে কংগ্রেস চরমপন্থী ও নরমপন্থী এই দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল।

একদিকে বিপ্লবীদের বোমা গুলি, অন্যদিকে কংগ্রেসের চরমপন্থীদের চাপ ইত্যাদিতে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন ঘোরালো হয়ে উঠছিল। তখন ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখলে অহিংসার পূজারি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবক্তা গান্ধীজীকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আমন্ত্রণ করে ভারতে নিয়ে আসেন। গান্ধীজী ভারতে আসেন ১৯১৫ সালে।

গান্ধীজী ভারতে এসে গুজরাটের সবরমতীতে সত্যাগ্রহ আশ্রম তৈরি করে দেশের নেতাদের অহিংস আন্দোলনের পাঠ দিতে আরম্ভ করলেন। গান্ধীজী তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে বলতেন— ''A Satyagrahi should expect to get killed by an aggressor and not to kill him''। অর্থাৎ তোমাদের মেরে কেটে শেষ করে দিলেও তোমরা কিন্তু কাউকে মারবে না, শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্দোলন করবে। তাঁর ফকিরের মতো বেশভূষা, অতি সাধারণ জীবনযাপন তাঁকে সাধারণ ভারতীয় জনতার কাছে অতীব জনপ্রিয় করে তুলেছিল। ইংরেজরা বুঝেছিল গান্ধীজীর হাতে যদি কংগ্রেস তথা ভারতের রাজনীতির রাশ থাকে তবে কংগ্রেসকে হিউম কথিত সেফটি ভাল্ব হিসেবে ব্যবহার করা সহজ হবে। তাই অহিংসার পূজারি গান্ধীজীকে তাদের মনে ধরেছিল এবং অত্যন্ত সুকৌশলে তারা ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল। ক্রমে কংগ্রেসের রাশ গান্ধীজীর হাতে চলে আসে।

গান্ধীজীর প্রথম বড় আন্দোলন ১৯১৯ সাল রাউলাট অ্যাক্ট-কে কেন্দ্র করে। এই কালাকানুনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিক্ষোভ আরম্ভ হলো। ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সত্যাগ্রহীরা যখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল তখন জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে তাঁদের উপর গুলি চালানো হলে প্রায় হাজার লোক মারা যায়। হতাহত হয়েছিল অসংখ্য। এর প্রতিবাদে সারা দেশ ক্ষোভে ফেটে পড়ল। গান্ধীজী তাঁর সত্যাগ্রহ পন্থা নিয়ে দেশ জুড়ে হরতালের ডাক দিলেন। এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতের মুসলমানরা ইংরেজের বিরুদ্ধে খিলাফত আন্দোলন শুরু করেছিল। গান্ধীজী মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার বাসনায় তাদের তোষণ করার জন্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের মতামত উপেক্ষা করে খিলাফতের মতো একটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক আন্দোলনকেও কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে নিলেন। যাই হোক, এই আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশই জোরদার হয়ে উঠলো। এরকম পরিস্থিতিতে ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরাতে আন্দোলনকারীদের পিকেটিংয়ের উপর ইংরেজের পুলিশ গুলি চালায় এবং ৩ জন মারা যান। ফলে উত্তেজিত জনতা ওখানকার থানা জ্বালিয়ে দেয়। এতে কিছু পুলিশ পুড়ে মারা যায়। ব্যাস, গান্ধীজী খেপে গেলেন। আন্দোলনকারীরা সত্যাগ্রহের শর্ত ভঙ্গ করেছেন এই অজুহাতে ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে এই আন্দোলন যুক্ত ছিল বলে সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিম লিগ কংগ্রেসকে হিন্দুদের পার্টি বলে মনে করতো। ওরা মনে করল হিন্দুরা ইংরেজের সঙ্গে যোগসাজশ করে ওদের আন্দোলন বন্ধ করেছে। ওদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল হিন্দুদের উপর। ফলে দেশের বিভিন্ন জায়গায় তারা হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চালালো। ইংরেজের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভের ধূমায়িত চাপ কংগ্রেস নামক সেফটি ভাল্বের ভেতর দিয়ে নির্গত হয়ে গেল। গান্ধীজী কিছুদিন শৌখিন জেল খাটার পর তাঁর সত্যাগ্রহ আশ্রমের আড়ালে চলে গেলেন। তিনি এই সময় লিখেছিলেন— 'My only hope lies in prayer and answer to prayer'। এই ভাবে গান্ধীজীর প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

১৯২৭ সালের শেষের দিকে সাইমন কমিশনকে কেন্দ্র করে আবার ক্ষোভ বিক্ষোভ বেড়ে গেল। ১৯২৮ সালের ৩০ অক্টোবর সাইমন কমিশনের প্রতিনিধিরা লাহোরে পৌঁছলে লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে তীব্র বিক্ষোভ দেখানো শুরু হয়। ইংরেজ পুলিশ অফিসার স্যানডরস তার বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা লাজপত রায়কেও প্রচণ্ড লাঠিপেটা করে। তার ফলে গুরুতর আহত হয়ে পরে লাজপত রায় মারা যান। লাজপত রায়ের হত্যার বদলা হিসাবে ১৯২৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর বিপ্লবী ভগত সিংহ, শুকদেব ও রাজগুরু স্যানডারসকে

হত্যা করেন। সারা দেশ উত্তাল। এই সময়ের মধ্যে দেশে বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডও বেশ বেড়ে যায়। ইংরেজ সরকার প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়ে। আবার গান্ধীজী আসরে নামলেন। ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ গান্ধীজী সাবরমতী আশ্রম থেকে ডান্ডি অভিযানের মাধ্যমে ইংরেজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার তাঁর অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। সারাদেশে এই আন্দোলন তীব্র ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ সরকারও প্রচণ্ড দমনপীড়নের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। তারা লাঠি চালাল, গুলি চালাল। বহু লোক মার যায়। অসংখ্য আহত হয়। ইংরেজ সরকার গান্ধীজী-সহ বহু কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করে। এইরকম পরিস্থিতিতে ১৯৩০ সালের মাঝামাঝিতে ব্রিটিশ সরকারের কাছে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট জমা পড়ল। ইংরেজ সরকার এই রিপোর্ট নিয়ে আলাপ আলোচনার জন্য কংগ্রেস নেতাদের লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানালো। এবং সেই কারণে গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হলো। ইংরেজ যখন আলোচনার জন্য ডেকেছে তখন নিশ্চয়ই ওদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে এই স্তোকবাক্য শুনিয়ে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে লন্ডনে গেলেন আলোচনার টেবিলে বসার জন্য। কিন্তু দেশবাসীকে হতাশ করে ফিরে এলেন খালি হাতে। এই ভাবে গান্ধীজীর দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটলো। কংগ্রেস নামক সেফটি ভাল্বের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর ক্ষোভ বিক্ষোভের তীব্র চাপ আবারও নির্গত হয়ে গেল। ইংরেজ ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ লাহোর জেলে ভগত সিংহ, শুকদেব ও রাজগুরুকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিল।

গান্ধীজী ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনও আন্দেলনকেই চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাননি। আন্দোলন দানা বাঁধতে আরম্ভ করলেই অবাস্তব কারণ দেখিয়ে তাকে বন্ধ করে দিতেন। তাই কংগ্রেসের চরমপন্থী তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র ইংরেজের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর এই অহিংস আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি বুঝেছিলেন এই ভাবে আন্দোলন করে ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা আদায় করা যাবে না। তাই ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসকে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করার জন্য রূপরেখা তৈরিতে মনোনিবেশ করলেন। গান্ধীজী ভীষণ বিরক্ত হলেন। তাই পরের বছর ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র পুনরায় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজীর কূটচালের কাছে পরাস্ত হয়ে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন । গান্ধীজী তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করেছিলেন। ইংরেজ হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

গান্ধীজীর তৃতীয় ও সর্বশেষ আন্দোলন ১৯৪২ সালের অগস্টের ভারত ছাড় আন্দোলন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪২-এর ৯ আগস্ট থেকে সারাদেশ জুড়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারত ছাড় আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তিনি। যদিও ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে ইংরেজের এই যুদ্ধে তাঁর নৈতিক সমর্থন ছিল। যেন কিছুটা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণেই এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। নেতৃত্বের রাশ আলগা হওয়ার ভয়ে এবার কিঞ্চিৎ মারমুখি ছিলেন গান্ধীজী, বললেন— 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। ইংরেজ সরকার শক্ত হাতে এই আন্দোলনের মোকাবিলা করল। ৯ আগস্ট সকাল বেলাতেই কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলো। নেতাহীন অবস্থায় আন্দোলন দিশেহারা হয়ে গেল এবং দু' এক সপ্তাহের মধ্যেই আন্দোলন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ইংরেজ সরকার। কংগ্রেসের বড়ো বড়ো নেতারা জেল নামক বিশ্রামাগারে বইপত্র পড়ে ও লিখে সময় অতিবাহিত করলেন। ক'জন কংগ্রেস নেতা সাভারকারের মতো আন্দামানের সেলুলার জেলে তেলের ঘানি টেনেছেন? ক'জন কংগ্রেস নেতা সুভাষচন্দ্রের মতো বার্মার মান্দলয় জেলে পড়ে থেকে অসুস্থ হয়েছেন?

এই যুদ্ধে ব্রিটিশ ছিল বিজয়ীর পক্ষে। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫-এ যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসের আন্দোলনের আর কোনও নামগন্ধই ছিল না। কংগ্রেসের বয়স্ক নেতারা ততদিনে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন। তাহলে যুদ্ধ শেষে, বিজয়ী ব্রিটিশ কীসের ভয়ে তড়িঘড়ি ভারতের স্বাধীনতা দেওয়া মনস্থ করেছিল এবং ১৯৪৭ সালে ভারত ছেড়ে চলে গেল? সে কি গান্ধীজী ও কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের ভয়ে? না কি অন্য ভয়? কী সেই ইতিহাস? আসলে কংগ্রেসের পুরো ইতিহাসটাই ভণ্ডামির। আজও দেশবাসীর সঙ্গে ভণ্ডামিই করে চলেছে তারা।

তথ্য সূত্র :

১. Modern India -by Bipan Chandra।

২. Modern India and World History by Provatangsu Maity and Dr. Sachhidananda Banerjee।

(৩) গান্ধী- অন্নদাশঙ্কর রায়।

(৪) ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা-ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

(৫) বিপ্লবী বীর সাভারকার—শ্রী হৃষীকেশ শীল।

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন
আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর
3 in 1 Account
(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

বিচার ব্যবস্থাকে ভারতের সংস্কৃতি ও পরম্পরার বিষয়ে আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন

বিশ্বনাথ বিশ্বাস

সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা চলে, কিন্তু মিথ্যার জন্য কোনও কিছু ত্যাগ করা চলে না। এটাই ভারতীয় জীবনমূল্যবোধ। অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠা ভারতীয় মূল্যবোধের মূল উপাদান। এই ভাবনা এসেছে ভারতের ধর্মচেতনা থেকে। ভারতে ধর্মই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। ভারতে ধর্ম জাতীয় জীবনসংগীতের প্রধান সুর। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"তোমরা যদি ধর্ম ছেড়ে পাশ্চাত্য জাতির জড়সর্বস্ব সভ্যতার দিকে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যেতে না যেতেই বিনষ্ট হবে।" মানুষই পারে ধর্মের পথে জীবন যাপন করে মাধব হতে বা অধর্মের পথে জীবনযাপন করে দানব হতে।

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, মানবতা, প্রকৃতি ও পরমাত্মা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তির স্বধর্মপালন বা কর্তব্যবোধই তার ধর্ম । আমাদের শাস্ত্রে এটাকে ব্যক্তিস্বাধীনতা বলা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি, প্রকৃতি ও পরমাত্মার প্রতি এই কর্তব্যবোধ থাকা উচিত।

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ শীর্ষ আদালতের রায়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে ভোগের স্বাধীনতাকে যথেচ্ছভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। Article–14, 15(1) এবং 21 ধারার অজুহাতে স্ত্রীকে পর পুরুষের সঙ্গে যথেচ্ছাচার অর্থাৎ ব্যভিচারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যা দীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত দাম্পত্যজীবনকে অবশ্যই তছনছ করে দেবে। IPC-এর ৪৯৭ নং ধারাকে নস্যাৎ করে শীর্ষ আদালত বলেছেন—'পরকীয়া আর অপরাধ নয়। ব্যভিচার বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে, কিন্তু তা ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য হবে না।" কারণ স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি নয়। স্ত্রীকে স্বাধীনভাবে ভোগ সুখের অধিকার দেওয়া হয়েছে শীর্ষ আদালতের রায়ে। বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেছেন, বিবাহ মানেই নারীর যৌন আচরণের সমাপ্তি নয়।' বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা বলেছেন, 'মহিলাদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে এমন আইন কখনও ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হতে পারে না। তবে মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকারকে যেমন সুরক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন, তেমনই মনে রাখতে হবে যে গোপনীয়তার অধিকার এবং মর্যাদার অধিকার যেন যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় না দেয়।' বিতর্কিত ধারাটিকে অসাংবিধানিক বললেও পরকীয়াকে নৈতিকতার বিচারে অন্যায় আখ্যা দিয়েছেন তিনি। শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পর অনেকে ভাবছেন, এই রায় দেশের সাংস্কৃতিক চেতনার পরিপন্থী। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মানেই পারস্পরিক বিশ্বাস। উভয়ের অধিকার এখানে সমান। কেউ কারো থেকে ছোট নয় বা বড়ো নয়। উভয়ে উভয়ের কাছে দায়বদ্ধ। বিবাহের সময় মন্ত্রে বলা হয়েছে—

যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদিদং হৃদয়ং তব।

তা ছাড়াও বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রী ৭টি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে পূর্ণ সাম্যের এবং সমর্পণের ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। সেখানে জড়বাদী সভ্যতার দোহাই দিয়ে অধিকারের তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়ে দাম্পত্য জীবন বা পারিবারিক জীবনকে কলুষিত করার প্রচেষ্টাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। আমরা জানি, ব্যক্তি বা পরিবার সমাজ জীবনের একক। তাকে কলুষিত করার জন্য আইনি ব্যবস্থা মানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জনজীবনকে নিদারুণ বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ করে তুলবে। এককথায় ত্যাগ সংযম সহমর্মিতা সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সমাজকে ঠেলে দেবে পূর্ণ ভোগবাদের দিকে।

এ প্রসঙ্গে অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী স্বামী অখণ্ডানন্দ পরমহংসদেব বলছেন, "মানবের ভিতরের বহুপরায়ণস্বরূপ পশুভাবকে বহু শতাব্দীর সংশোধনের মধ্য দিয়েই এক-পরায়ণ সতীত্ব মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে। যে দেশে বা সমাজে পুরুষ বা নারী সুসংহত ও জিতেন্দ্রিয়, সেই দেশের অধিকাংশ কলহ আপনাআপনিই মিটে যায়।"

বিচারপতি চন্দ্রচূড় নাকি প্রশ্ন তুলেছেন, ভারতীয় পরিবারগুলিতে সাধারণভাবে নারী নিগৃহীতা এবং নির্যাতিতা। এই নিগৃহীতা এবং নির্যাতিতা বলতে কী বোঝাচ্ছেন তা স্পষ্ট করে বলেননি। মনে হয়, এখানে তিনি যৌনলালসা তৃপ্তির দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, পরিবারের স্ত্রী যদি অন্য কারও কাছে ক্ষণিক আশ্রয় খুঁজে পান, তাতে ক্ষতি কী? এই ক্ষণিক আনন্দের খোঁজে স্ত্রী যদি একবারের জয়গায় বারবার পরকীয়ার আশ্রয় নেন, তাকে কি নারী স্বাধীনতা বলা হবে? একজনের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পরিতৃপ্ত না হলে, সে অন্যজনের কাছে যাবে। এইভাবে সমাজ হয়ে উঠবে ব্যভিচারের তীর্থক্ষেত্র। আজকাল পত্রপত্রিকার খবরে জানা যাচ্ছে যে পরকীয়ার কারণে খুনখারাপি বেড়ে চলেছে। আর একটা বিন্দু ভাবিয়ে তুলছে যে, এই পথে উৎপাদিত সন্তানসন্ততির অভিভাবক কে বা কারা হবেন? তাদের শেষ আশ্রয় অনাথ আশ্রম বা কোনো

সহৃদয় অভিভাবক। যারা এই ধরনের অবিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত হবে, তাদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলবে। কোনো অনুশাসনের পরিমণ্ডলে না থাকায় তারা হয়ে উঠবে বেপরোয়া। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলো সমাজবিরোধীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। এইভাবে সমাজের সর্বস্তরে নেমে আসবে অনাচার আর উচ্ছৃঙ্খলতা। শেষমেশ তারাই নিয়ন্ত্রণ করবে সমাজ। বিচারপতি চন্দ্রচূড় কি পরুষতন্ত্রের হাত থেকে নারীকে বাঁচানোর তাগিদে নারীকে ব্যভিচারের পথে ঠেলে দিচ্ছেন না? ব্যক্তিস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে স্বামী বা স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হবে—এটা মেনে নেওয়ার মানে ত্যাগ সংযম ন্যায়নীতির বিসর্জন। কারণ তাঁর ব্যক্তব্যে বাধা বারণ আবরণ কিছুই রইল না। তাঁর মতে সমাজ হবে ব্যক্তিগত ভোগলালসা চরিতার্থ করার মুক্তাঙ্গন। পরকীয়ার কারণে সন্তান বাবাকে বাবা জেনেও অশ্রদ্ধা করবে। তেমনভাবে মাকে মা জেনেও অশ্রদ্ধা করবে। সব কিছু জেনেও শীর্ষ আদালত ভারতের দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে চায়।

আমাদের দেশে পিছিয়ে পড়া জনজাতি সমাজেও বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করা হয়। স্বামীকে পছন্দ না হলে স্ত্রী তার পছন্দের পুরুষের সঙ্গে চলে যেতে পারে স্বামীর ঘর পুরোপুরি ত্যাগ করে। যদিও আজকাল জনজাতি সমাজে স্বামী ত্যাগ করে চলে যাওয়ার ঘটনা বিরল। শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা এ খবর রাখেন কি?

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ''জগতের ইতিহাস হইল—পবিত্র, গম্ভীর চরিত্রবান এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন কয়েকটি মানুষের ইতিহাস।'' ভারতের শীর্ষ আদালত সমাজ জীবনের পবিত্রতা ধ্বংস করে সমাজকে কোন পথে নিয়ে যেতে চান? মনুষ্য জীবনের সর্বোচ্চ সম্পদ হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা চরিত্র এবং বিশ্বাস। যদি স্বাধীনতা, সাম্য ও আধুনিকতার নামে পরকীয়া বা ব্যভিচার তথা পাশব চেতনার জয়ধ্বনি দিয়ে তাকে আইনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তবে তা হবে ভারতবর্ষীয় জীবনের আত্মহত্যা।

বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলছেন, ''বিয়ে কোনও নারীর কাছ থেকে তার যৌনতার অধিকার কেড়ে নেয় না। ব্যক্তিগত জীবনে পছন্দের গুরুত্ব রয়েছে। যৌনতাকে তার থেকে আলাদা করে দেখা যায় না।'' পরকীয়া বা ব্যভিচার যদি অপরাধ বলে গণ্য না হয়, তাহলে বিবাহ বন্ধনের প্রয়োজন কী? মহামান্য বিচারপতি চন্দ্রচূড় খবর রাখেন কি, আমাদের দেশে অনেক স্ত্রী আছেন, যাঁরা স্বামীর নিকট থেকে কিছু না পেয়েও সংসারের দায়িত্ব পালন করেন। বিচারপতি চন্দ্রচূড় মনে হয় বলবেন—তারা বোকা গাধা।

বিবাহ মানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার ঊর্ধ্বে উঠে নিজেদের মধ্যে সব ব্যাপারে সহমত হয়ে সুন্দর পরিবার গড়ে তোলা। এইভাবে তাদের দ্বারা এমন প্রজন্ম গড়ে উঠবে যারা সমাজকে সত্যসুন্দরের পথে নিয়ে যাবে। যে শীর্ষ আদালতের কাছে মানুষের প্রত্যাশা, তাঁরা সমাজকে শৃঙ্খলা এবং অনুশাসনের মধ্য দিয়ে আদর্শ সমাজ গঠনের পথ দেখাবেন। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁরাই কিনা সমাজকে ঠেলে দিচ্ছেন ভোগলালসা পরিতৃপ্তির পথে। যদি কোনো স্বামী বা স্ত্রী তার শারীরিক ক্ষুধা মেটানোর জন্য অন্য কাউকে চান, তিনি ডিভোর্স দিয়ে পছন্দের মানুষের কাছে চলে যেতে পারেন। কিন্তু দাম্পত্যজীবনে থেকে অন্য কারও সঙ্গে যৌনসম্পর্ক গড়ে তোলা মানে সমাজকে কলুষিত করা। বিচারের মানদণ্ডে এটাকে অপরাধ বলে গণ্য করা উচিত। তা না হলে দেশ ব্যভিচারে পূর্ণ হয়ে উঠবে। ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি ধ্বংসের পথ ধরবে। তবে আশার কথা, পাঁচ বিচারপতির মধ্যে তিনজন দ্বিমত পোষণ করেছেন।

আমার বিনীত নিবেদন, সংবিধানের ৪৯৭ নং ধারা সংশোধন হতে পারে সমান দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিত্তিতে। যে সাম্যের বাণী আমাদের বিবাহের মধ্যে নিহিত আছে তাকে ভিত্তি করে নতুন করে আইন প্রণয়ন হোক। ধরা যাক, নং ১৪, ১৫(১) এবং ২১ যেখানে বিভিন্ন অধিকারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারও পুনর্বিবেচনা করা উচিত। তা করা উচিত ভারতবর্ষীয় চেতনার আলোকে। ভারতীয় দর্শনে বলা হয়েছে—'যথা পিণ্ডে তথা ব্রহ্মাণ্ডে' অর্থাৎ ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র মানবতা প্রকৃতি ও পরমাত্মা সবাই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ব্যক্তির স্বধর্মপালন বা কর্তব্যবোধই তার অধিকার। প্রত্যেক ব্যক্তির পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি, প্রকৃতি ও পরমাত্মার প্রতি এই কর্তব্যবোধ আবশ্যক। এককথায় ব্যক্তির কর্তব্যপালনই তার অধিকার। ব্যক্তি এমন কিছু করবে না যা সমাজ ধর্মবোধ এবং সংস্কৃতিকে অবনমিত করে। ভারতচেতনার আলোকে আইন প্রণয়ন করা উচিত। কারণ ভারতবর্ষ সমাজকে দেখেছে ধর্মের এক জীবন্ত দেহ, জাগ্রত অবয়ব এবং দিব্য পুরুষরূপে। তাই আমরা এমন কিছু করতে পারি না যা ভারতীয় সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে।

আমরা জানি, ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল ৪টি স্তম্ভ—(১) আইন বিভাগ, (২) আইন কার্যকরী করার বিভাগ, (৩) বিচার বিভাগ, (৪) জনমত। সাম্প্রতিক রায় শীর্ষ আদালত জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। যেমন—(১) পশ্চিমবঙ্গের ২০১৮ এর বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোটি কোটি মানুষের ভোটদানের অধিকার অস্বীকার করে গণতন্ত্রের মূল ভাবনা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে লিভ টুগেদার প্রশ্নে সমর্থন জানিয়ে সমাজকে বেলেল্লাপনার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। আমরা জানি, সমকামের প্রশ্নে বিশ্বের প্রধান ধর্মগুরুরা কখনও অনুমোদন দেননি। গত ২৭ সেপ্টেম্বর পরকীয়া প্রশ্নে শীর্ষ আদালত সমর্থন জানিয়েছেন। ভারতবর্ষীয় জীবনের আধার সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। বেশ কয়েকটি রায়দানে রাষ্ট্রীয় ভাবাবেগ উপেক্ষা করে জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ করে দেশটাকে যথেচ্ছারের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। আমাদের সংবিধানের প্রথম ছবিই 'শ্রীরামের জীবনদর্শন'। কারণ রামরাজ্যই ভারতবর্ষীয় জীবনের লক্ষ্য। আমরা জানি জনসাধারণের অভিযোগের শ্রেষ্ঠ প্রতিকার শীর্ষ আদালত। সেই অভিযোগের প্রতিফলন ঘটে পত্র পত্রিকায় এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। এইসব মাধ্যমের খবরাখবর অস্বীকার করে শীর্ষ আদালত সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠনের পথ দেখাবে কি করে? তাই শীর্ষ আদালতের বিচার পদ্ধতি প্রশ্নচিহ্নের মুখে। এখন ভাবনা, বিচার পদ্ধতির পরিবর্তন না আইনের কয়েকটি ধারার পরিবর্তন না কোন বিকল্প পদ্ধতি।

পরিশেষে, ৪৯৭ নং ধারার সংশোধন করা উচিত এবং সম্পর্কিত অন্যান্য ধারার সংশোধন হওয়া উচিত ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির আধারে। আর ব্যক্তিগত অধিকারের অর্থ কী—তার সীমারেখা কতদূর, ইত্যাদি বিষয়ে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা উচিত। আমার একান্ত প্রার্থনা—'সত্যমেব জয়তে' সার্থক হোক আমাদের সাংবিধানিক পদ্ধতিতে।

দেশের সোনা সরকারের অধীনে থাকা দরকার

অষ্টম কুমার মাঝি

ভারত গরিব দেশ। উন্নয়নশীল দেশ। অনেকে বলে থাকেন India is rich country consisting of poors. কথাটা আরও স্পষ্ট করে বলতে হলে বলা যায় India is rich country shouldering by poors। বাস্তবটি হলো এই যে গরিবের কাঁধে ভর করে ধনীরা নাচছেন। এটা আসলে মনকে চোখ ঠারা।

ভারত রশম্ বা রেওয়াজের মান বাঁচাতে কেরানিরূপী গরিবের থেকে রাজস্ব নিয়ে স্বচ্ছল, সঙ্গতিপন্নদের সম্ভ্রান্তপনার মান বাঁচাচ্ছে। কর্ম করে যারা অবসর নিচ্ছে তাদের পেনশন বা ভাতার নামে আমরণ অর্থ দিয়ে যাচ্ছে। যদিও ভারতে সাংবিধানিক নিয়ম আছে No Work no Pay।

ভারত প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্র। প্রজাই প্রজাকে শাসন করছে, প্রজার উপর কর চাপাচ্ছে, কর না দিলে দণ্ডেরও ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ রাজা ও প্রজা, শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের দুরত্ব মুছে যাচ্ছে না। আচার আচরণ, সম্ভাষণেও তার ছবি ফুটে ওঠে—হুজুর, মহাশয়, সাহেব ইত্যাদি। সাহেবকে আসন পেতে বা চেয়ার টেনে দেওয়া হয়। সমাদরে জল খাবারেরও ব্যবস্থা করা হয়। নির্দেশনামায় সেই আজ্ঞাবাহকের মতো ভাষা—ওরে এই, এ দিকে আয়। এটা করিস ওটা করিস। অনেক সময় গরিবের আবেদনও নেওয়া হয় না, তাচ্ছিল্যভরে ফেলে দেওয়া হয়। ইত্যাদি নানা রকম পদের অধিকার ব্যবহার করা হয়।

কর্ম করা, রোজগার করা, খাওয়া দাওয়া করা আর বেঁচে থাকা এটা মানুষের প্রকৃত জন্মগত অধিকার। খাটবে, পারিশ্রমিক নেবে, কেনাকাটি করবে। পারিশ্রমিকও মালিকের হাতে, দয়ার দানের মতো। ধর্মশাস্ত্রে বলেছে—'কর্মণ্যে বাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন।' আরও বলা হয়েছে যে, কর্ম তুমি ত্যাগ করতে অর্থাৎ ছাড়তে পারো না। কর্মীর কর্ম করাই অধিকার—পারিশ্রমিকের অধিকার নেই। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অধিকার কর্মীর নেই। মালিকের ইচ্ছায় ফল দেরিতে দেওয়া মানে কর্মীর আনাহারে থাকা। না খেয়ে মরে গেলেও ক্ষতি নেই। কর্ম করা, পারিশ্রমিক নেওয়া, খেয়েদেয়ে জীবনে বেঁচে থাকা কি ধর্মের মধ্যে পড়ে না? যদি এগুলি ধর্ম হয় তা হলে এমন পক্ষপাতের বাণী কেন? যদি বলা হয় অধ্যাত্ম বিচারের কথা—তাহলে এ ব্যাখ্যা শাশ্বত নয়। খালি পেটে হরিনাম কেউই গাইতে পারবে না।

অন্যভাবে দেখলে দেখা যায়, পারিশ্রমিক মালিকেরাই নির্ধারণ করেন। এটি জানালা থেকে সমুদ্র দেখে সমুদ্র মাপার ঘটনার মতো। যাই হোক, কর্ম করলে মজদুরির কিছু একটা অঙ্ক দেওয়া হয়ে থাকে। তবে মজদুরি বা বেতনের তত্ত্ব বিভিন্ন রকমের। এখানে স্থায়ী কর্মচারী আছে, অস্থায়ী কর্মচারী আছে, ঠিকা শ্রমিক আছে, দিনমজুর আছে, চাকর-বাকরও আছে। স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয় অর্থ কমিশন বসিয়ে বেতন ঠিক করে। তারা স্থায়ী কর্মচারীদের অবসরকাল ঠিক করে দেন এবং মাসিক পেনশনও ঠিক করে দেন। অস্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিকদের GDP-র উপর ভিত্তি করে বেতন ঠিক করা হয়। Minimum Wages Rules আছে। তবে পেনশনের কোনও প্রশ্ন নেই। তবে আজকাল Provident Fund-এর আওতায় এনে কিছু মালিক পেনশন যা যৎকিঞ্চিৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দিনমজুর বা শ্রমিক ও চাকর বাকরদের কোন নিশ্চিত মজুরি নেই। তাদের পেনশনের কথা তো ভাবাই হয় না। অন্তত Minimum Wage Rules-এর মধ্যে এনে তাদেরকেও Provident Fund-এর আওতায় এনে পেনশন ভুক্ত করা যেতে পারে। তবে সর্বত্রই একই নিয়ম No Work No Pay। Pension দেবার ক্ষেত্রে চাকুরির বয়স ও সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তবে সব ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে জনসেবায় যারা পদাধিকারি রয়েছেন তারা কোনও রকমে মন্ত্রকে কম করে তিন বছর থাকলেই পেনশন পাওয়ার উপযোগী। রাজনীতিকদের ক্ষেত্রে বয়সের কোনও সীমারেখা নেই।

Pension যারা পাচ্ছেন তাঁরা Commissioned Salary পান এবং তা GDP হিসেবের কয়েকগুণ বেশি। চাকুরির বয়সসীমা ৬০ বছর বা ৩৫ বছর হলে তবেই অবসর পান। অর্থাৎ ৬০ x ১২ =

৭২০ মাসের মাইনে হাতে পায়। এই বেতন তাদের সংসার গড়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট। তা ছাড়া কর্মজীবনে ঋণ ইত্যাদি মিলিয়ে অনেক সুবিধা পান। কাজেই তাদের পেনশনের নামে বেতনের ৫০ শতাংশ যুক্ত DA দেবার কোনও অর্থই হয় না। সেই পেনশনের টাকা দিয়ে বেকার যুবক যুবতীদের কাজে নিয়োগ করলে দেশের অনেক সমস্যা সমাধান হতে পারে। তা ছাড়াও পিতা-মাতা ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে একটা Generation Gape থাকে। বাবা পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরি করতে থাকলে ছেলের বয়স হয় পঁচিশ বছর। অর্থাৎ একুশ-বাইশ বছরে স্নাতক, তেইশ বছরে এম.এ. পাশ ও দু'বছর অন্য কোনও প্রযুক্তি শিক্ষা নিয়ে পাঁচিশ বছর বয়সে যে কোন চাকুরি কাজের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে ওঠে। এবার বাবাকে পঞ্চাশ বছর বয়সে কিছু Gold handsum দিয়ে অবসরে পাঠালে বাবাও সংসারে ফিরে এসে সে টাকা দিয়ে ছোট ছোট Project তৈরি করে তুলতে পারে। কারণ এই বয়সে সে কর্মক্ষম থাকে এবং টাকাকে নয়ছয় না করে যে কোনো ভাবে বিনিয়োগ করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা অবশ্য করে থাকবে। চাকুরিজীবনে মেনে চলা বিধিবিধান স্মরণ থাকার জন্য অপরাধমূলক কাজের থেকে বিরতই থাকবে। সেও তার কাজের মধ্যে অনেক দিন মজুরদের পেটের ভাতের ব্যবস্থা করতে পারবে। কিন্তু এমন হয় না। কারণ জনতার সার্বিক পরিস্থিতি বা অবস্থান বিচার করে হিতকর বা মঙ্গলজনক ব্যবস্থা কেউ করতে চায় না। তাই সেই উপনিবেশিক ধারায় বয়ে যায়। তাই আজ কাজ না করলেও পেনশনের নামে অর্থ দিয়ে রাজসেবক বা রাজকর্মী হিসেবে তুলে ধরে রাখে।

অন্যদিকে ভারতের সোনা। আজও ভারত 'সোনেকি চিড়িয়া'। ভারতবর্ষে এত লুটপাট হওয়া সত্ত্বেও ভারতে সোনার অভাব নেই। নেই নেই করে এখনও লক্ষ টনেরও বেশি সোনা আছে। সম্প্রতি একটি পত্রিকায় 'ভারতীয় স্থাপত্যের বিস্ময়ের আড়ালে সোনার ভান্ডার' শিরোনামে একজন বেশ কিছু মুখ্য সোনার ভাণ্ডারের কথা লিখেছেন। প্রথম কেরলের পদ্মনাভস্বামী মন্দির। ছয়টি খিলানের মধ্যে স্বর্ণ রত্ন মানিক ভরা আছে। ২০১১ সালে জুন মাসে একটি খিলান খুলে দেখা যায় তার মধ্যের অলংকারের মূল্য ছিল বাইশ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ১৪, ১৬,৬৯০০,০০,০০০ টাকা। দ্বিতীয় মোক্বাম্বিকা মন্দির কর্ণাটক। এখানে স্বর্ণভাণ্ডার আছে যার মূল্য ১০০ কোটি টাকার বেশি, এই মন্দিরের বার্ষিক আয় সতেরো কোটি টাকা। তৃতীয় বালাকিলা, আলওয়ার রাজস্থান। জাহাঙ্গির নির্বাসিত হবার সময় তার ধনভাণ্ডার বালাকিলার জঙ্গলে লুকিয়ে রাখেন। খোঁজার জন্য অনুসন্ধান চলছে।

চতুর্থত জয়গড় দুর্গ। জয়পুরে কথিত আছে যে মানসিংহ ১৫৮০ সালে আফগান জয় করে ফেরার সময় সমস্ত ধনসম্পদ জয়গড় দুর্গের আঙিনায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। খোঁজার অনুসন্ধান চলছে। পঞ্চমত অন্ধ্রপ্রদেশের বেঙ্কটেশ্বর ভগবানের তিরপতিমালা মন্দির। এটি ভারতের সবথেকে ধনী মন্দির। মন্দিরটি পুরো প্রায় সোনার পাত দিয়ে মোড়া। ২০১৬-র হিসেবে এই মন্দিরের রোজগার প্রতি দিন ১,০০০ কোটি ছাড়িয়ে যায়। এখানে টন টন সোনা আছে।

আধাসামরিক বিভাগে কাজ করতে করতে এগুলির মধ্যে অনেকগুলি নিজের চোখে দেখেছি। এর সঙ্গে আমার নিজের দেখা আরও স্থানগুলির কথা বলছি। পাদুচেরিতে অম্বা মন্দিরের গম্বুজটি সোনা দিয়ে আবৃত। মাদ্রাজ থেকে ১০/১২ কিলোমিটার দুরে ভেলোরির শ্রীপুরের লক্ষ্মী মন্দির। মন্দিরটি প্রায় তিনশতক জায়গা জুড়ে। নয় থেকে দশ ফুট উঁচু এবং এই মন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে সোনার পাত দিয়ে মোড়ানো। পঞ্জাবে গুরুদ্বারা, দিল্লির শিস্‌মহলের উপরটি সোনা দিয়ে মোড়ানো। মহাক্ষেত্র পুরীর মন্দিরে প্রচুর সোনা তিনটি খিলানের মধ্যে ভরা আছে। ইদানীং একটি খিলান খোলার চেষ্টা করেও পারেনি। সোমনাথ মন্দিরেও নেই নেই করে এখনও পাঁচ ছয় টন সোনা আছে। কথিত আছে বিক্রমাদিত্যের তুলারাশি পুষ্কর লগ্নে স্থাপিত গৃহে মা মহালক্ষ্মী রাজার উপর সন্তুষ্ট হয়ে রাজ্যে স্বর্ণবণ্টন করিয়েছিলেন। সেই সোনা আজমিরের ফয়সাগড়ে রাখা হয়েছিল। ফয়সাগরে তৈরি ছাতার মধ্যে ওই গড় খোলার চাবিকাঠির হিসাব আছে। খোঁজার জন্য অনুসন্ধান চলছে। জয়পুরের রাজবাড়ি থেকে পাওয়া কয়েক টন সোনার বিস্কুট দিল্লিতে এনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই সোনার নিলাম করেছিলেন। ইদানীং সত্য সাই বাবার আশ্রমেও প্রচুর সোনা পাওয়া গিয়েছে। এইসব হিসাব করলে বোঝা যায় ভারতে সোনার অভাব নেই। লক্ষ লক্ষ টন সোনা এখনও আছে। তবুও ভারত এক গরিব দেশ।

ভারত গরিব দেশ। কারণ ওই সোনা ভারত সরকারের অধীনে নেই। এই সোনা উদ্ধার করে ভারত সরকারের অধীনে রাখলে ভারত এই বিশ্বে প্রথম সমৃদ্ধিশালী দেশ হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। মাত্র ৫৫০ টনের মতো সোনা ভারত সরকারের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে মাত্র।

ভারতে এত সোনা, তবুও বিশ্ববাজারে ক্রয়-বিক্রয়ে আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ইংল্যান্ডের ডলার, পাউন্ড, ইত্যাদিকে ৬০, ৬৫, ৬৮, ৭০ টাকায় কিনতে হয়। দুর্ভাগ্য। অবশ্য এটি আন্তর্জাতিক শোষণ পদ্ধতিও বলা চলে। বিশ্ববাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম যখন সোনা তখন সবদেশের সোনার মূল্য একই হওয়া উচিত। ভারতের টাকাও তো রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সোনা চাঁদির মুল্যায়নের উপর মুল্যায়িত এবং টাকার মধ্যে অঙ্গীকারও করা থাকে I promise to pay the bearer the sum of one hundread Rupees. সুতরাং অসুবিধা কোথায়? ডলার, পাউন্ড, টাকা এগুলি তো হুন্ডির মতো। সোনাকে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই এইসব token value সবদেশেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ কী জন্যে গড়ে তোলা হয়েছে। শোষণকে প্রশ্রয় দেবার জন্য কি? দেশের মানুষ বিচার করুন। ■

বাংলাদেশে নির্বাচন আসে হিন্দুদের দুঃস্বপ্ন নিয়ে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশে গাছের জন্য, নদ-নদীর জল দূষণের জন্য কাঁদার লোক আছে। কিন্তু গুটিকয়েক সচেতন মানুষ ছাড়া হিন্দুদের জন্যে কাঁদার লোক নেই। কয়েকদিন আগে ঢাকায় নাগরিক সমাজের উদ্যোগে 'জাতীয় নির্বাচন : সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা' শীর্ষক আলোচনা সভায় এক বক্তা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে একথা বলেন। আলোচনা সভায় আরও উঠে আসে, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন ও হামলা নিয়মিত ব্যাপার, নির্বাচন এলে কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তাই স্বাভাবিকভাবে নির্বাচন এলেই সংখ্যাঘুরা উদ্বেগ ও আতঙ্কে থাকেন। বক্তারা বলেন, নির্বাচনে পরাজিত দল সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালায় একারণে যে, পরের নির্বাচনে যেন সংখ্যালঘুরা এই্ দলের পক্ষে ভোট দেয়। আর বিজয়ী দল হামলা চালায় এ কারণে, সংখ্যালঘুদের সন্ত্রস্ত রাখতে হবে যাতে তারা ভয়ে ভয়ে থাকে, কথা শোনে। ভবিষ্যতে আর কোথাও যেন ভোট না দেয়। এই হচ্ছে বাংলাদেশে নির্বাচনে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু সমাজের অবস্থান।

আগামী নির্বাচনকে ঘিরে সংখ্যালঘুদের মধ্যে উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে শুধুমাত্র ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছাড়া প্রত্যেকটি নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হয়েছে। ২০০১ সালে নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা একাত্তরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। হামলা, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও জায়গাজমি দখল এক ভয়াবহ অধ্যায় তৈরি করে। বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের ভারতে চলে যাওয়া নতুন কিছু নয়, কিন্তু ওই নির্বাচনের পর ব্যাপক হারে হিন্দুরা ভারতে চলে যায়। সিপিএম তখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায়। মন্ত্রী ও নেতারা তখন বলেছিলেন, বাংলাদেশে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি হয়নি। ঠিক যেমনটি জ্যোতিবাবু ১৯৯০ সালে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে বাঁচাতে বিবৃতি দিয়েছিলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সেদেশে কোনও সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটছে না। অথচ ওই সময় সাম্প্রদায়িক হামলায় অন্তত তিন হাজার মন্দির ও বাড়িঘর আগুনে ভস্মীভূত কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ঐতিহাসিক ঢাকেশ্বরী মন্দির হামলাকারীরা গুঁড়িয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ঢাকেশ্বরী মূর্তি ভেঙে কয়েক টুকরো করার পর আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আর এদেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে যারা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়ে বাম রাজনীতি

করছিলেন, মন্ত্রিত্ব করছিলেন তাঁরা এরশাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এই ভয়াবহ হামলার পর প্রখ্যাত লেখিকা তসলিমা নাসরিন কয়েকটি মর্মস্পর্শী ও প্রতিবাদী লেখা লেখেন ভারতের কয়েকটি কাগজে। বামমন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস বলেছিলেন, তসলিমা সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছেন।

গত ৩০ ডিসেম্বর বাংলাদেশে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন কমিশন কড়া নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে বেশ কয়েকটি জেলায় সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ ১৫ ডিসেম্বর রাতে হামলা হয়েছে ফেনির শীল পাড়ায়। কয়েকটি পরিবার খোলা আকাশের নীচে বাস করছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাণা দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, কয়েকটি জেলায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার খবর এসেছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক হচ্ছে, নির্বাচনে নিরাপত্তাহীনতার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবার ইতিমধ্যে দেশত্যাগ করেছে। তারা নাকি স্থানীয়দের জানিয়ে গেছেন, পরে অবস্থা দেখে তারা ফিরে আসার কথা ভাববেন। রাণা দাশগুপ্ত বলেছেন, অন্তত ৩০টি সংসদীয় আসনে বর্তমান আওয়ামি লিগ সাংসদরা ওইসব এলাকায় হিন্দুদের ওপর কয়েকবছর ধরে নির্যাতন করে আসছেন। হিন্দুদের জায়গা-জমি দখল করেছেন। মহিলাদের অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয়েছে। ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে এই সাংসদদের আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার জন্যে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামি লিগ সভাপতি শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু শেখ হাসিনা কর্ণপাত করেননি। তিনি এই সাংসদদেরই আবার মনোনয়ন দিয়েছেন। রাণা দাশগুপ্ত বলেছেন, এসব এলাকার সংখ্যালঘুরা অত্যন্ত শঙ্কিত। নির্বাচনে কী হবে! ওরা আবার নির্বাচিত হয়ে এলে সংখ্যালঘুদের অবস্থা কী দাঁড়াবে!

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির এক প্রতিবেদনে বলেছেন, দেশের তিনশো সংসদীয় আসনের মধ্যে ৯৬টিতে সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছেন ১০ শতাংশের বেশি। এর মধ্যে ৫৮টি নির্বাচনী এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঝুঁকি রয়েছে। তিনিও বলেছেন, বর্তমান সাংসদদের মধ্যে অনেকেই সাম্প্রদায়িক। এরা আবার মনোনয়ন পাওয়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর ঝুঁকি আরও বেড়ে গেল।

বাংলাদেশের রাজনীতি এখন দু'শিবিরে বিভক্ত। আওয়ামি লিগ ও বিএনপি। বর্তমান আওয়ামি লিগের সঙ্গে রয়েছে ধর্মান্ধ ও মধ্যযুগীয় গোঁড়া আদর্শে বিশ্বাসী হেফাজতে ইসলাম ও তালেবানি আদর্শে বিশ্বাসী ইসলামি ঐক্যফ্রন্ট-সহ দেশের বেশিরভাগ ইসলামি দল। আর বিএনপির সঙ্গে আছে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী জামায়াতে ইসলামি ও কয়েকটি ইসলামি দল। আওয়ামি লিগ নতজানু হেফাজতের কাছে, বিএনপির চালিকাশক্তি জামায়াত। দু' শিবিরই দাবি করছে, তারা কৌশলের রাজনীতি করছে। আর এই পরিস্থিতির মধ্যে সংখ্যালঘুরা বিশেষ করে হিন্দুরা অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি। ■

চিঠিপত্র

হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কেন?

অসমে হিন্দু নিধন কাশ্মীরের প্রতিচ্ছবি কিনা সেটা সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে। রাজনৈতিক ক্ষমতাশালী সাংবাদিক মিডিয়া টিভির টকশোতে হিন্দুদের প্রতি নক্কারজনক ভাবে 'হিন্দুত্ববাদী' শব্দটি বিষবাক্য বাণে ক্ষত-বিক্ষত করছে। বিগত দিনে আমরা দেখেছি বিজ্ঞানমঞ্চে শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের সমালোচনা, ব্যঙ্গ উপহাস করা হয়। এটা হিন্দুধর্মকে বিলীন করার অপচেষ্টা নয় কি?

অন্যদিকে দলিত, নমঃশুদ্র, বনবাসীদের নিয়ে বিভাজনের রূপরেখা রচনা করা হচ্ছে। প্রশ্ন জাগে, হিন্দুধর্ম যদি না থাকে এই সব সম্প্রদায় টিকে থাকবে কি?

পৃথিবীতে যে ধর্ম সবচেয়ে প্রগতিশীল কুসংস্কার মুক্ত হয়ে এগিয়ে চলছে, যে ধর্ম জগৎ মঙ্গলের কথা বলে, যে ধর্ম জগতের কল্যাণ কামনা করে, দ্বিজাতি তত্ত্বে হিন্দু রক্তের প্লাবন ঘটিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দ্বারা দেশ দ্বিখণ্ডিত করে স্বাধীন হয়েছে, তবুও হিন্দুগণ বহুত্বের মিলন বলতে গর্ববোধ করে। আজ আমাদের ভাষা সংস্কৃতি ভিতর ও বাইরে থেকে আক্রান্ত। যেমন— আকাশকে আশমান, রামধনুকে রংধনুতে পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আবার হিন্দুধর্মের আলিঙ্গন অতি পবিত্র রীতি। কিন্তু আমরা সংসদে দেখলাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে যেভাবে হাফ-ভারতীয় রাহুল গান্ধী আলিঙ্গন ও চোখ টেপা দৃশ্যটি দেখালেন, হিন্দুধর্মের সংস্কৃতিকে ব্যঙ্গ ও উপহাস করারই নামান্তর নয় কি? সূক্ষ্ম চেতনার দ্বারা ভাবা একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
সাহেবের হাট, রাশিডাঙ্গা,কোচবিহার।

বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা তথৈবচ

মুখে যে যতই আস্ফালন করুক না কেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। হিন্দুদের পতন অবশ্যম্ভাবী। যে নেত্রীই ভারতের প্রতি সহানুভূতির বাতাবরণ সৃষ্টি করুন না কেন, হিন্দুদের অবস্থা সেই তলানিতেই থেকে যাবে। এর আগের নির্বাচনে হিন্দু সাংসদ ছিল ১৬ জন। এবারে সেখানে কমে হয়েছে ১৩ জন। এরপর শূন্য হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। ওদিকে খালেদা জিয়ার দলও সেভাবে কথা রাখেনি বলে হিন্দু সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তাদের কথায় এখন পর্যন্ত তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। কখন না জানি তাদের ওপর বিরাট সংকট নেমে আসে! তারা মঠ মন্দির, ব্যবসা বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রেই অশনি সংকেত দেখতে পাচ্ছে। হিন্দুদের এখন এমনিই অবস্থা হয়েছে যে, 'ভিক্ষা চাই না মাগো কুকুরটা ঠেকাও'। ভারতের সংখ্যালঘু আর বাংলাদেশের সংখ্যালঘুর যেন বিস্তর ফারাক। ওখানকার সংখ্যালঘুরা ওদেশের রাজনৈতিক নেতাদের দয়া ভিক্ষার ওপর বেঁচে আছে। এভাবে আর কয়দিন চলে। নির্বাচন এলে হিন্দুদের যেন শিরে সংক্রান্তি। সব কিছুর জন্য দায়ী যেন হিন্দুরা। ভোটের আগে চলে এক ধরনের অত্যাচার, আবার ভোটের পরে অন্য ধারা। এমনকী ভোটকেন্দ্রে গিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে লক্ষ্য করে হিন্দুরা কোন দলকে ভোট দিচ্ছে। সব সময় সুযোগ খুঁজতে থাকে, একটু এদিক ওদিক হলেই চলবে জোর শাসানি। মোদ্দা কথা, হিন্দুরা হয়েছে ওদের নিকা করা বউয়ের মতো। এক স্বামী ছেড়ে আরেক স্বামীর ঘরে এলে যেমন বউ বেকায়দায় পড়ে তেমনি অবস্থা। ভাবে কখন বা দ্বিতীয় তালাকের খাতায় নাম ওঠে। হিন্দুরা বর্তমান এ সেই আশঙ্কার দিনগুলিই গুনে চলেছে।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর।

মহাপুরুষ ও দেশনেতাদের মূর্তি সংরক্ষণ

মহাপুরুষ ও দেশনেতাদের মূর্তি-স্থাপন পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য দেশে দেখতে পাওয়া যায়। দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্বাধিকারবোধ প্রতিষ্ঠায় এই ব্যক্তিদের স্মরণ দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। কৃতজ্ঞ দেশবাসী এই দেশভক্ত ও গুণী মানুষদের প্রতি এভাবেই খানিকটা নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। অন্য ভাবেও এই স্মরণ হতে পারে। কিন্তু সহজ, সরল, অনাড়ম্বর পথে এই মূর্তি-স্থাপন অধিকাংশ দেশবাসীর হৃদয়-মনের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ।

মূর্তি না হয় প্রতিষ্ঠা হলো। এর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু অধিকাংশ স্থাপিত মূর্তির যত্ন নেওয়া হয় না!! ধুলো ও পাখির বিষ্ঠায় ভরে যায় এই সকল মূর্তি।

সম্প্রতি ব্যারাকপুর থেকে আসছিলাম শ্যামবাজারের দিকে। পথে বাস টিটাগড়ের একটি স্টপে দাঁড়ালো। রাস্তার পাশে একটি ছোটোখাটো হাফ-মূর্তির দিকে চোখ পড়ল। ভারতমাতার এক শ্রেষ্ঠ সন্তান পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের শুকনো মালা, ধুলোয় ভরা মূর্তি। রাস্তায় ধারে দীনদয়ালজীর মূর্তি এভাবে পড়ে থাকায় বড়ই বেদনা পেলুম। 'একাত্ম মানবতার' পথ প্রদর্শক দীনদয়ালজীর মূর্তি এভাবে রাস্তার ধারে রাখা যায় না! যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই মূর্তির স্থাপয়িতা, দ্রুত এই দিকে নজর দিলে ভালো করবেন। এভাবেই রাস্তা, ফুটপাত, পার্কে ও অন্যত্র দেশের গুণী মানুষ ও দেশনেতাদের মূর্তি পড়ে থাকতে দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট স্থাপয়িতাদের এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া দরকার। মহাপুরুষ ও দেশনেতাদের স্মরণ হোক মর্যাদাপূর্ণ।

—রণজিৎ সিংহ,
কলকাতা-৬।

সঙ্ঘকে টেক্কা দেবে কংগ্রেস সেবাদল?

খবরে প্রকাশ, কংগ্রেস সেবাদল সঙ্ঘকে টক্কর দিতে এবার 'ধ্বজ বন্দনা'র আয়োজন করছে। তারা দেশের এক হাজার শহরে প্রতিমাসের শেষ রবিবার ধ্বজোত্তোলন পূর্বক করবে কর্মসূচি পালন এবং তিনমাস সারাদেশে সেবাদলের প্রশিক্ষণ শিবির করবে। কংগ্রেস সেবাদল কী করবে না করবে সেটা তাদের

নিজস্ব ব্যাপার। তবে সঙ্ঘকে টেক্কা দিতে যদি তারা ওই সব কার্যক্রমের পরিকল্পনা করে থাকে তাহলে তারা 'মূখের স্বর্গে' বাস করছে। কোথায় সঙ্ঘ, আর কোথায় কংগ্রেস সেবাদল! রীতি, নীতি ও আদর্শে যাদের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক।

১৯২৫ সালে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার প্রতিষ্ঠা করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা আর এস এস। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চরিত্রবান, ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক মানুষ নির্মাণ করা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ভারত একদিন স্বাধীন হবেই। কিন্তু সৎ, ত্যাগী ও দেশভক্ত মানুষ তৈরি না হলে সেই স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে কঠিন। কারণ তিনি নিজেই ছিলেন একজন কারাবরণকারী স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাছাড়া একজন চিকিৎসক হয়েও তিনি সাধারণ রোগের চিকিৎসা কখনও করেননি ঠিকই, কিন্তু হাজার বছরের পরাধীন ভারতে বিদেশি শাসকদের শাসন, শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের শিকার হওয়া হিন্দুদের মানসিকতায় অনৈক্য, গ্লানি, কাপুরুষতা, দাসত্ব, হতাশা, দুর্বলতা ও হীনম্মন্যতা যে মানসিক রোগের জন্ম দিয়েছিল, সেই মানসিক রোগের চিকিৎসায় তিনি জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছেন। মাত্র ৫ জন স্বয়ংসেবক নিয়ে ডাঃ হেডগেওয়ার নাগপুরে যে সঙ্ঘ শুরু করেছিলেন, আজ দেশ-বিদেশে তার সংখ্যা ৫০ সহস্রাধিক এবং স্বয়ংসেবক ও সঙ্ঘানুরাগীর সংখ্যা অন্তত ২৫ কোটি। সঙ্ঘের দৃষ্টিতে সঙ্ঘ হচ্ছে 'মানুষ তৈরির সংগঠন' আর শাখা হচ্ছে 'মানুষ তৈরির কারখানা'। ডাঃ হেডগেওয়ার প্রথম জীবনে রাজনীতি, বিশেষত কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তিনি উপলব্ধি করতে পারছিলেন রাজনীতির ছত্রছায়ায় থেকে শৃঙ্খলাপরায়ণ, অনুশাসিত, নির্লোভ ও দুর্নীতিমুক্ত মানুষ নির্মাণ অসম্ভব। তাই তিনি রাজনীতি ত্যাগ করে গঠন করেন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, যার অনুগামীরা দৈনন্দিন শাখায় উপস্থিত হয়ে শারীরিক ও বৌদ্ধিকভাবে সমৃদ্ধ হন। আর সত্য ও ত্যাগের প্রতীক গেরুয়া পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে নেয় ত্যাগ, ভক্তি ও দেশপ্রেমের শপথ।

পক্ষান্তরে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের অবসরপ্রাপ্ত স্বারাষ্ট্র সচিব অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। অর্থাৎ কংগ্রেসের জন্মদাতা এক ব্রিটিশ। তবুও বহু দেশভক্ত স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষ কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় থেকে করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রাম। অনেকে দিয়েছিলেন আত্মবলিদানও। তবে একশ্রেণীর ক্ষমতালোভী কংগ্রেস নেতার বিশ্বাসঘাতকতায় দেশবাসী পেল খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা। সে এক রক্তাক্ত ও বিয়োগান্তক ইতিহাস। অতঃপর স্বাধীনোত্তর ভারতে কংগ্রেসে ঢুকে পড়ে দুর্নীতির 'ভাইরস্'। আর তাইতো কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর রাজত্বকালেই ঘটেছিল জিপ-কেলেঙ্কারির ঘটনা। আর আজ? কংগ্রেস ও দুর্নীতি সমার্থক। প্রমাণ? ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতি মামলায় কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী ও তাঁর মা সোনিয়া আদালতে অভিযুক্ত হয়েছেন। এহেন কংগ্রেসের সেবাদল! আসলে সেবাদলের সেবকরা দীর্ঘদিন ভোগ-বিলাসে মজে থেকে থেকে সেবাটাই ভুলে গিয়েছেন। এখন কংগ্রেস দলটাই যখন উঠে যেতে বসেছে তখন সেবকদের হুঁশ ফিরেছে। আর এস এসের উত্থানে আতঙ্কিত কংগ্রেস তাই সঙ্ঘকে পাল্টা দিতে সেবাদলকে মাঠে নামিয়েছে। কিন্তু সঙ্ঘ শাখায় যেখানে প্রতিদিন হয় ধ্বজ বন্দনা এবং বছরে চারটি সঙ্ঘ প্রশিক্ষণ শিবির হয় সেখানে সেবাদল করবে সপ্তাহে একদিন ধ্বজ বন্দনা এবং সারাদেশে তিন মাস সেবাদলের প্রশিক্ষণ শিবির? এ তো 'পর্বতের মূষিক প্রসব!' আশা থাকা ভালো, কিন্তু দুরাশা ভালো নয়। তবুও কংগ্রেস যদি সঙ্ঘকে টেক্কা দিতে কোনও উদ্যোগ নেয়, তবে তা হবে 'বামন হয়ে চাঁদে হাত' দেওয়ার শামিল।

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

বাঘ কেন রাষ্ট্রীয় পশু?

বর্তমানে আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় পশু বাঘ। বাঘের পূর্বে ছিল সিংহ। মাধুর্য, শক্তিমত্তা, তৎপরতা ও অভাবনীয় ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হয় বাঘকে। বাস্তবে কি তাই? বাস্তবে বাঘ বা সিংহ দুর্বল পশুদের শিকার করে বা শিকার করতে বাধ্য হয়। সুযোগ পেলে মানুষকেও খেয়ে ফেলে। সুন্দরবনে বা বনাঞ্চলে বাঘের আক্রমণে অনেক মানুষ মারা যায়। আমার সাধারণ বুদ্ধিতে বাঘ ক্ষতি ছাড়া মানুষের কোনও উপকারই করে না। অন্যদিকে, মানব সভ্যতায় গোরু, মহিষ, হাতি, ঘোড়া, উট, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশুর অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। গোরুর উপকারিতা বিশ্বে তুলনাহীন। অশ্ব গতির প্রতীক। তাই মনে প্রশ্ন জাগে, আমরা যে পশুদের কাছে ঋণী, তাদের বাদ দিয়ে ঘাতক বাঘকে রাষ্ট্রীয় পশু করা হয়েছে কেন? সময় এসেছে নতুন করে ভাবার।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

সাংবাদিক চাই

স্বস্তিকা পত্রিকায় অসম এবং ত্রিপুরার খবরের অভাব অনেকদিন ধরেই আমরা অনুভব করছি। আমরা মনে করি ওই দুই রাজ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের জীবনধারণের প্রকৃত ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের কাছে তুলে ধরা দরকার। তাই, ত্রিপুরার আগরতলা এবং উত্তর অসমের শিলচরের যুবক-যুবতীদের প্রতি আমাদের আবেদন, নিউজ রিপোর্টিংয়ে যদি কারও আগ্রহ থাকে তাহলে অবিলম্বে নীচে দেওয়া ঠিকানায় এক কপি পাসপোর্ট-সাইজ ছবি-সহ সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জি পাঠান। জীবনীপঞ্জি ই-মেলও করা যেতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য ফোন করুন সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বরে।

স্বস্তিকা

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬
Email : swastika 5915@gmail.com
সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বর : ৮৪২০২৪০৫৮৪

হোমিওপ্যাথিতে লিভারের সিস্ট ভালো হয়

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

এখন অনেক তরুণ-তরুণীর লিভারে সিস্ট দেখা যাচ্ছে। প্রশ্ন কেন লিভারে সিস্ট হয়? গবেষকরা জানিয়েছেন, শরীরের ভিতরের কোনও ইনফেকশন, ব্লিডিং, আঘাতজনিত কারণ অনেক সময় সিস্টের আকার নিতে পারে। ইনফেকশন থেকে লিভারের মধ্যে জমা পুঁজ অনেক সময়ই সিস্টের আকার নেয়। যাকে চিকিৎসার পরিভাষায় বলা হয় অ্যাবসেস! কোনও ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকেও এই অ্যাবসেস হতে পারে। প্যারাসাইটিক ইনফেকশন থেকে হাইডাটিড সিস্টও হতে পারে। এই ইনফেকশন আবার ফুসফুসেও ছড়িয়ে পড়তে তা সিস্টের আকার নেয়। এছাড়া জন্মের সময় কিছু ত্রুটির কারণে খুব অল্প বয়সেই লিভারে একসঙ্গে অনেকগুলো ছোটো ছোটো সিস্ট হতে পারে। এই সিস্ট হলে তার ফলে কিডনিতেও এই সিস্ট দেখা যেতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে শরীরের অন্য অঙ্গে ক্যানসার-জনিত কারণের জন্য লিভারে সিস্টের মতো দেখা যায়। যা আসলে সিস্ট নয়, পেটের ক্যানসার। প্যাংক্রিয়াস ক্যানসারে ও গলব্লাডারের ক্যানসার থেকে এই ধরনের লিভারের সমস্যা দেখা যায়। তাই পেটে কোনওরকম সমস্যা বোধ হলে সতর্ক থাকুন। জন্মগত অর্থাৎ লিভারের সঙ্গে যুক্ত ধমনি জিনগত কারণে ঠিকমতো তৈরি না হলে সেই স্থানে হেমাঞ্জিমা হতে পারে। এটি দেখতে খানিকট সিস্টের মতোই হয়। যদিও এটি সিস্ট নয়।

লক্ষণ : বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শরীরের অন্য অসুখের কারণে টেস্ট করতে গিয়েই সিস্ট ধরা পড়ে। সাধারণত এর কোনও লক্ষণ থাকে না। লক্ষণ বলতে পেটের ডানদিকের ওপরের দিকে মাঝেমধ্যে ব্যথা হয়। শরীরে একটা অস্বস্তি হতে থাকে। হঠাৎ করে সিস্টের মধ্যে ব্লিডিং শুরু হলে সেক্ষেত্রে ব্যথা হতে দেখা যায়। অনেক সময় জ্বর আসতে পারে। হঠাৎ করেই জন্ডিস ধরা পড়তে পারে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : অনেকেই মনে করেন, সিস্ট মানে অপারেশন করতেই হবে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কি আদৌ সিস্ট সারে? আমি বলব হ্যাঁ, সারে। আমার পিতৃদেব ডাঃ প্রকাশ মল্লিক একজন প্রবীণ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। তাঁর কাছে প্রতিদিন বেশ কিছু সিস্টের রোগীকে আমি আসতে দেখেছি। তাদের সিস্ট ভালো হচ্ছে, তা আলট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে দেখা গেছে। তিনি এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন। যদি ইনফেকশন-জনিত কারণে সিস্ট হয় তাহলে তিনি বেলেডোনা, হিপার সালফার, সাইলেশিয়া, টিউবারকুলিয়াম সিফিলিয়াম ব্যবহার করেন। আর যদি লিভারজনিত কারণে সিস্ট হয় তাহলে টিলিয়ি, বলডো, চেলিডোনিয়াম, কুরেশিয়া, ফ্যালেটাওরি, এরালিয়া এইচ প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন। প্যাংক্রিয়াসের সমস্যাজনিত কারণে সিস্ট হলে রুবিয়া, আইরিসভাস, প্যাংক্রিটিনাম, ফ্যালটাওরি, সিউম্যানস্ট্যাস জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন। জন্মগত কারণে হলে প্যারাথাইরয়েডিনাম, আরএনএ, ডিএনএ প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন। তবে মনে রাখা দরকার এই সমস্যা হলে কখনই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসক তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করে থাকেন, যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

যোগাযোগ : ৩০৫০২৫৫৩

অঙ্গনা

সাইবার উৎপীড়ন বাড়ছে, সাবধান হতে হবে মা-বাবাকে

বি কে রোশনী

সমাজবিজ্ঞানী থেকে চিকিৎসক, মনোজ্ঞিানী থেকে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন সাইবার উৎপীড়নের প্রতিকার কী তা জানার জন্য। কারণ শুধু কিশোর-কিশোরীরাই নয়,যুবক-যুবতীরাও এর শিকার হচ্ছে। দেখা দিচ্ছে আতঙ্ক, উদ্বেগ, বিষন্নতা ও অবসাদ। পরিত্রাণ পেতে কেউ বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার পথ। শুধু তাই নয়, চোখ-কান খোলা রাখলে দেখা যাবে ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রী বা মধ্যবয়স্করাও এই মানসিক উৎপীড়নের শিকার হতে বাধ্য হচ্ছেন। অভিভাবক, সমাজবিজ্ঞানী বা মনোবিজ্ঞানীদের এই নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে, তার সঙ্গে সাইবার এক্সপার্টদেরও ভাবতে হবে কীভাবে এই উৎপীড়ন থেকে সব স্তরের মানুষকে বাঁচানো যায়। আইন করে কিছু হবে না। সমাজের সব স্তরে সচেতনতা প্রয়োজন। কারণ অনেক সময় সাইবার বুলিং ছেলে-মেয়েরা মা-বাবার সঙ্গেও করে থাকে। এমনকী আত্মহত্যার ভয়ও দেখিয়ে থাকে।

অভিভাবকদের উদাসীনতাও এই প্রবণতার জন্য দায়ী। ছেলে-মেয়েদের সময় না দেওয়া, অত্যধিক পড়াশোনার চাপ, মা-বাবা দুজনেই বাইরে কাজ করার জন্য সন্তানের একাকিত্ব, এক্সট্রাকিউরিকুলার অ্যাক্টিভিটিস ইত্যাদি। কিন্তু সমাধান যখন খোঁজা হচ্ছে তখন এর দায়িত্ব সবাইকেই নিতে হবে। এর জন্য প্রকৃত শিক্ষা ও সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। এর সমাধানের জন্য বাড়িতে মা-বাবারা কতকগুলি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন—

(১) একই মোবাইল ফোন ছেলে ও বাবা, মেয়ে ও মা'র ব্যবহার করা দরকার। (২) অসঙ্গতি কিছু দেখলে পুলিশের সাহায্য নিন। (৩) অন লাইনে ব্যক্তিগত তথ্য আদান-প্রদান বন্ধ করতে হবে। (৪) বাড়িতে

একটাই ল্যাপটপ থাকা প্রয়োজন। তা সবাই যেন ব্যবহার করতে পারে। তাহলে লুকানো কিছু থাকবে না। (৫) টিন এজারদের ইন্টারনেট ব্যবহার করতে না দেওয়াই ভালো। (৬) যখনই কেউ সাইবার বুলিংয়ের শিকার হবে তখনই অভিভাবকদের জানানো দরকার। এতে দু'পক্ষেরই মঙ্গল হবে। (৭) ভয় পেলে চলবে না। ভয়কে জয় করতে হবে। জয় করার সহজ উপায় মেডিটেশন। (৮) যখনই মানসিক বিপর্যয় দেখা দেবে মনোচিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে। দেরি হলে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। (৯) নিজেকে মোবাইলে নয়, গান-বাজনা, ভালো ভালো বই পড়া, খেলাধুলায় ব্যস্ত রাখতে হবে। (১০) স্কুলে মোবাইল ফোন একদম নয়। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া মোবাইল ফোন ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে। (১১) একাকিত্ব থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে। (১২) রাতে সন্তানদের মা-বাবার সঙ্গ দিতে হবে (১৩) সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যারা উৎপীড়ন করছে তারা আইনে চোখে অপরাধী। যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদেরকেও মানসিক শক্তি বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে আইনের সাহায্য নিতে হবে। (১৪) মহিলা ও পুরুষদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। প্রতিবাদী হতে হবে ও আইনের সাহায্য নিতে হবে। লজ্জায় বা ভয়ে চুপ থাকা চলবে না। (১৫) সুস্থ মানসিকতা ও সুস্থ জীবনশৈলীর জন্য রোজ সকাল-বিকেল ধ্যান করতে হবে। (১৬) রোজ দশবার করে ওম্ ধ্বনি, ভ্রামরী প্রাণায়াম ও গায়ত্রীমন্ত্র জপ করুন। দশ মিনিট করলেই চমৎকার ফল পাওয়া যাবে। সম্প্রতি দিল্লির এইমস্ হাসপাতালের চিকিৎসক ও বিভিন্ন আই আই টি-র একদল গবেষকের মতে গায়ত্রীমন্ত্র রোজ উচ্চারণ করলে মানসিক শান্তি লাভ করা যায় এবং বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে। বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশই প্রতিটি মানুষকে সাইবার বুলিং বা স্টকার্স্ সিনড্রোম বা বিকৃত রুচি থেকে অনায়াসে মুক্ত রাখতে পারে। (১৭) আদর্শ মা-বাবাই পারেন আদর্শ সন্তান গড়ে তুলতে। সেজন্য মা-বাবাকে আদর্শবান, মূল্যবোধসম্পন্ন ও চরিত্রবান হওয়া দরকার। নিজেরা যা শিক্ষা দেব, তা নিজের জীবনে পালন করে তারপর শিক্ষা দিতে পারলে সন্তানসন্ততি উপকৃত হবে। (১৮) সচেতনতার সঙ্গে সবাই শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিয়ে সবাই এগিয়ে চলুন। সন্তানকে সঠিক পথে এগিয়ে চলতে নিজেরা সচেষ্ট হন।

মনের মধ্যে নানা খেলা চলছে। তারজন্য সচেতন থাকুন। নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক হয়ে উঠুন। মনে রাখতে হবে, মূল্যবোধ হারিয়ে গেলে সব শেষ। সেজন্য সমাজে আজ বহু অবগুণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একে রক্ষা করার দায়িত্ব সমাজের সবার হলেও মা-বাবার দায়িত্ব সর্বাগ্রে। ■

INDIAN EXPRESS

Mrs Gandhi to appeal: No resignation

Strong party backing to continue as leader

Opposition plan 7-point strategy

কংগ্রেসের ইতিহাস শুধু মিথ্যাচার ও ভণ্ডামির

দেবযানী হালদার বসু

কংগ্রেস আধুনিক ভারতের প্রথম সংগঠন যার প্রতিষ্ঠাতা একজন ব্রিটিশ অফিসার, অ্যালান অক্টাভিয়াম হিউম। ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর থেকে স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের সব থেকে চর্চিত সংগঠন এই কংগ্রেস। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা প্রশ্নাতীত। গান্ধীজী কংগ্রেসের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী না হলেও স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর কংগ্রেস টিকে থাকল, গণতান্ত্রিক দল থেকে পরিবারতান্ত্রিক দলে পরিবর্তন হলো। আর এই ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে দরকার হয়ে পড়লো একটার পর একটা মিথ্যাচারের ও ছলনার, যার ফল ভোগ করেছে দেশ আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আপামর জনসাধারণ।

কংগ্রেসের প্রথম দিকের বিখ্যাত নেতারা ছিলেন দাদাভাই নৌরোজি, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপত রাই, অরবিন্দ ঘোষ, ভি. ও. চিদম্বরম পিল্লাই, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, ফিরোজশাহ মেহতা প্রমুখ। এরপর এল মোহনদাস গান্ধীর যুগ। কংগ্রেসের আমূল পরিবর্তন হলো তাঁর নেতৃত্বে। নতুন নেতাদের উদ্ভব হলো। ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে আবির্ভূত হলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, নরহরি পারিখ। তাঁরা গান্ধীবাদী বলে পরিচিত হলেন। অন্য দিকে চিত্তরঞ্জন দাশ, রাসবিহারী বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারদের মতো উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতার নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নতুন রূপ ও দিশা পেল। এই সময় গান্ধীজী কংগ্রেসের খোলনলচে আমূল বদলে ফেললেন। অভিজাতদের দল থেকে সাধারণ মানুষের দলে পরিণত হলো কংগ্রেস। সাধারণ সদস্য পদ গ্রহণ সহজ হয়ে গেল চাঁদার পরিমাণ কমিয়ে। ভাষার ভিত্তিতে কংগ্রেস প্রদেশ কমিটি গঠন করল। এর ফলে সর্বসাধারণের কাছে কংগ্রেস পরিচিতি পেল। জাতি, ধর্ম, লিঙ্গের ভিত্তিতে নয়, কংগ্রেসিদের ভারতীয় হিসেবে পরিচিত হবার বিষয়ে জোর দেওয়া হলো। গান্ধীজীর সুপারিশে সাধারণের কথ্য ভাষা উর্দুর পুনর্নামকরণ হয়ে হিন্দুস্থানি ভাষাকে ইংরেজির বদলে ব্যবহার করা শুরু হলো। সমস্ত পদে নির্বাচনের মাধ্যমে লোক নেওয়া হলো যাতে যোগ্য ব্যক্তি সুযোগ পায়, দলে গণতন্ত্রের সূচনা হল যাতে ভবিষ্যতে সদস্যদের কোনও সমস্যা না হয়। সাধারণ সদস্যদের বক্তব্যের গুরুত্ব দিতে শুরু করল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। নেতা হবার জন্য সামাজিক প্রতিপত্তি বা সম্পত্তি মাপকাঠি থাকল না, সমাজসেবা মূলক কাজকেই প্রাধান্য দেওয়া হলো। এইসব কারণে কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা যেমন বাড়ল, ঠিক তেমনি গান্ধীজী নিজেকে শুধু কংগ্রেস নয় দেশের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন।

আর ঠিক এই জায়গাতেই শুরু হলো মিথ্যাচার। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য মিথ্যাচারের এই যে প্রচলন কংগ্রেসের মধ্যে শুরু হলো, আজও চলছে সমান ভাবে। সেই সময় থেকে দল থেকে গণতন্ত্র উধাও হয়ে গেল। ব্যক্তিসত্তা এত বড় হয়ে গেল যে নেতাজীর মতো নেতাও অবহেলিত হয়ে গেলেন। পরবর্তী সময়ে নেতাজীকে সরিয়ে দেওয়া হলো আর দেশবাসীর কাছে একটার পর একটা মিথ্যা খবর রটানো হলো। সেই শুরু তবে তা স্বাধীনতার আগে।

স্বাধীন ভারতের জনগণকে সবচেয়ে বড় ধোঁকা দেওয়া হলো জওহরলাল নেহরুকে প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচন করে। দেশের মানুষের সঙ্গে কতটা প্রতারণা করা হলো সে খবর জানল না সেই সময়ের জনগণ।

১৯৪৬ সালেই সুনিশ্চিত হয়ে যায় ব্রিটিশ ভারত ছাড়ছেই। ক্ষমতা হস্তান্তর হবার আগে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। যেহেতু সেই বছর কংগ্রেস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, তাই তার প্রেসিডেন্ট হবে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং পরে তিনিই হবেন স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তখন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেস

প্রেসিডেন্ট ছিলেন (১৯৪০---১৯৪৬)। গান্ধীজী তাকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে বলেন। নেহরু বরাবর তাঁর পছন্দের ব্যক্তি ছিলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে। নতুন প্রেসিডেন্টের নাম মনোনয়ন পেশ করার শেষ দিন ছিল ২৯ এপ্রিল, ১৯৪৬। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করার ক্ষমতা ছিল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির। দুটি নাম ছিল নেহরু আর সর্দার প্যাটেল। গান্ধীজী সবাইকে বলে দিয়েছিলেন নেহরুকে নির্বাচন করতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৫ জন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সদস্যের ১২ জন সর্দার প্যাটেলকে নির্বাচন করেন ও ৩ জন ভোট দেননি।

এইভাবে অকস্মাৎ হেরে যাবেন গান্ধীজী ভাবতে পারেননি। তিনি তখন পিছন দরজার সাহায্য নেন। গান্ধীজী তখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের ভোট দিতে এক রকম বাধ্য করেন যাতে নেহরুকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট করা যায়। আর নিজের ভেটো ক্ষমতা দিয়ে সর্দার প্যাটেলকে আটকে দেন। যদিও নিয়ম অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটির ভোট দানের বৈধতাই ছিল না। ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ জওহরলাল নেহরু অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হলেন ও পরে স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীও। অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবস থেকেই কংগ্রেস প্রতারণা করল। মিথ্যাচার করল আপামর জনসাধারণের কাছে। এরপর সংবিধান তৈরির কাজ শুরু হল। অসংখ্য দেশীয় রাজ্যের ভুক্তি হলো ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য নির্ধারিত হলো আলাদা নিয়ম সংবলিত ধারা ৩৭০। এই ধারায় জম্মু ও কাশ্মীর স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেল। সামরিক, বৈদেশিক নীতির জন্য ভারতের উপর নির্ভর করলেও জম্মু কাশ্মীরের পৃথক সংবিধান তৈরি হল এই ধারায়। এই ধারা একটি অস্থায়ী ও বিশেষ ধারা হিসাবে সংবিধানের মধ্যে রাখা হয় যা ১৯৫৭ সালের মধ্যে বাতিল করার ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়। যদিও ১৯৫৭ সালের মধ্যে এই ধারা বাতিলের কোনও চেষ্টা তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার করেনি। আর আজ তাই ৩৭০ ধারা স্থায়ী ধারায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। কংগ্রেস কখনোই দেশের কাছে ধারা ৩৭০ নিয়ে প্রকৃত সত্য তুলে ধরেনি। এক দেশের মধ্যে দুটো সংবিধান, দুটো পতাকার তীব্র প্রতিবাদ করেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এক রহস্যজনক ঘটনায় শ্রীনগরে মৃত্যু হয় এই বীর নেতার। পাছে কলকাতার রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল স্তব্ধ করে দেয় কংগ্রেসের রথ, তাই ট্রামের ভাড়া এক পয়সা বাড়িয়ে তিন দিন কলকাতা কার্যত অচল করে মানুষের মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জনগণকে সত্য জানানোর সাহস কংগ্রেসের নেই।

কংগ্রেসের ভুল নীতি, কেন্দ্রীয় নেতাদের অপদার্থতার জন্য ভারত তার মানচিত্র বদলে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। অথচ জনগণের কাছে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে। ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধে ভারতের লজ্জাজনক পরাজয়ের কারণ নেহরুর অযোগ্য নেতৃত্ব এবং অদূরদর্শিতা। চীনের সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাকে যুদ্ধে নামাতে বারণ করেন আর্মি চিফ জেনারেল থাপার। কিন্তু ১০ই সেপ্টেম্বর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন জেনারেল থাপারের নিষেধ সত্ত্বেও ভারতীয় সেনাকে যুদ্ধে নামতে বলে বিদেশ চলে যান। কিন্তু কোনও লিখিত অর্ডার দেওয়া হয়নি বলে জেনারেল থাপার সেনা নামাননি। এক অসম যুদ্ধ হয়। অদ্ভুত ভাবে বায়ুসেনাকে নামানো হয়নি। সাধারণ পোশাক পরে ওই উচ্চতায় ঠাণ্ডায় যখন আর্মি বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত তখন ২০ নভেম্বর রাত্রে জাতির উদ্দেশে ভাষণে নেহরু বলেন যে আক্রমণকারীরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত ভারতীয় সেনা বিশ্রাম নেবে না। দেশবাসীকে প্রকৃত সত্য জানানোই হলো না যে নেহরুর মূর্খতা, জেদের জন্য দেশের একটা বড় অংশ চীন দখল নেয়। ভারতের মানচিত্র বদলে গেছে, এই সত্য জানানোর সাহস কংগ্রেসের ছিল না, আজও নেই।

কংগ্রেস আজ যখন কোনও নির্বাচনে হেরে ইভিএম হ্যাকের মতো জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ করে, সে তার পুরানো ইতিহাস ভুলে যায়। এখনও পর্যন্ত কোনও কংগ্রেস নেতা বা বশংবদ তাঁবেদার কেশবানন্দ ভারতী কেস বা রাজনারায়ণ কেসের উল্লেখ করেন না। কেশবানন্দ ভারতী মামলার জন্য ভারতীয় সংবিধান তার মূল কাঠামোকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। যদিও পরে এমারর্জেন্সির সময় অসাংবিধানিক পদ্ধতিতে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়। সংবিধান সংশোধন করার জন্য যে নিয়মের কথা সংবিধানে উল্লেখ আছে তার একটাও মানা হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষ মানে যে হিন্দু বিরোধিতা, মুসলিম তোষণ তা কংগ্রেসের আমদানি। তাই শুরু থেকেই হিন্দু কোড বিল চালু হয় কিন্তু একই দেশের মুসলিম মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয়। তাদের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়নি। তিন তালাকের মতো নির্মম প্রথা যা বেশিরভাগ মুসলিম দেশে বাতিল হয়ে গেছে, শুধু মাত্র ভোটের রাজনীতির জন্য ভারতবর্ষে চালু থাকে। এক দেশের সব নাগরিক সমান আইনি সহায়তা না পাওয়া অবশ্যই একটি মিথ্যাচার। তাই শাহ বানু মামলায় একটি তালাকপ্রাপ্ত অসহায় মুসলিম নারী আইনের দ্বারস্থ হয় খোরপোষের জন্য। হিন্দু নারী সেকশন ১২৫ এ খোরপোষের নিশ্চয়তা ও সুরক্ষা পেলেও শুধুমাত্র মুসলিম হবার জন্য সে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। যে আইনে এই বৈষম্য সেই আইন ধর্মনিরপেক্ষ হয় কী করে? শাহ বানু সুপ্রিম কোর্টে জিতে গেলেও রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস সরকার আবার আইনের পরিবর্তন করে। কারণ ভোট বাঁচাতে হবে, গদি বাঁচাতে হবে, তাতে দেশের জনগণের স্বার্থ গোল্লায় যাক। ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ, এই দ্বিচারিতা কংগ্রেসের স্বাধীনতার প্রথম থেকেই। তাই Indian Council of Historical Research গঠনের পর ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের

ইতিহাস লিখতে দেওয়া হয়নি। তারাচাঁদের মতো এক পদলেহনকারী আমলা দায়িত্ব পান স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লেখার যা আসলে কংগ্রেসের ইতিহাস, বেশি স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস কম। দেশবাসীকে প্রকৃত দেশভাগের ঘটনা জানতে দেওয়া হলো না কৌশল করে। এক্ষেত্রেও প্রতারণা করা হলো দেশবাসীর সঙ্গে।

১৯৭১ সালে রাজনারায়ণ ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়িয়ে হেরে যান। এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা করেন রাজনারায়ণ। শান্তিভূষণ রাজনারায়ণের পক্ষে সওয়াল করেন। ভারতীয় ইতিহাসে এটি নজিরবিহীন ঘটনা। ইন্দিরা গান্ধী মামলায় হেরে যান। নির্বাচনে রাজ্যের প্রশাসনকে ব্যবহার করেছিলেন বলে কোর্ট রায় দেয়। ভোটারদের ঘুষ দেওয়ার মতো অভিযোগ প্রমাণিত হয়। যার ফলে তাঁর সাংসদ পদ বাতিল হয়ে যায় ও ছয় বছরের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত করা হয়। চার বছর মামলা চলে। এটা ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রধান কারণ যদিও কংগ্রেস কখনোই স্বীকার করে না। সংবিধানের মূল কাঠামো পরিবর্তন, নিজের সাংসদ পদ বাঁচিয়ে রাখা, ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার টিকিয়ে রাখার জন্য বিরোধী শূন্য পার্লামেন্টের দরকার ছিল। দরকার ছিল একচ্ছত্র শাসনের অধিকার। এমারজেন্সি ভারতীয় গণতন্ত্রে একটি কালো অধ্যায় যার সত্যতা সম্বন্ধে নীরব থেকেছে কংগ্রেস।

ভারতে দীর্ঘ ষাট বছরের কংগ্রেস রাজত্বে মিথ্যাচারের অভাব নেই। জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকা গ্রহণের ক্ষেত্রেও প্রতারণা করেছে। ফ্ল্যাগ কমিটি স্বাধীন ভারতের জন্য গেরুয়া পতাকার সুপারিশ করলেও অবশেষে কংগ্রেসের পতাকার সামান্য রদবদল করে জাতীয় পতাকা নির্ধারণ করা হয়। একই জিনিস হয় জাতীয় সংগীত নির্ধারণের ক্ষেত্রে। যে বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ লক্ষ সংগ্রামীর রক্তের ছোঁয়া আছে, মিথ্যাচার করে তাকেও বাতিল করে কংগ্রেস। মুসলমানদের ধর্মীয় আঘাতের মিথ্যা তত্ত্ব খাড়া করে একটি মন্ত্রকে তার যোগ্য সম্মান জানাতে পারল না দেশবাসী। এই অপরাধ গুরুতর। কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃত্ব সহজেই এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে পারত। এখনো পর্যন্ত কংগ্রেসের সৎসাহস হয়নি সঠিক তথ্য জনসমক্ষে আনার।

দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে আপোশ করা হয়েছে বহুবার। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে রহস্যজনক ঘটনায়। কোথাও তদন্ত হয়নি। আবার কোথাও নামমাত্র লোক দেখানো তদন্ত হয়েছে। রহস্যের উন্মোচন হয়নি বিখ্যাত পরমাণু বৈজ্ঞানিক ড. হোমি ভাবার মৃত্যুর। সত্য জানতে পারেনি ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানের জনক বিক্রম সারাভাইয়ের মৃত্যুরও। পোস্টমর্টেমের আদেশ দেওয়া হয়নি তাসখন্দে হঠাৎ মৃত তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর। ইচ্ছা করে ভুল ওষুধ দেওয়া হয় অন্যতম বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। এই তালিকা দীর্ঘ হবে, তবে শেষ হবে না।

দেশের প্রতি প্রবঞ্চনা এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু এখন কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি যা করছেন তা শুধু মিথ্যাচার নয়, প্রহসন। রাজনৈতিক ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না পেরে একের পর এক মিথ্যা দোষারোপ করছেন। কখনো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপর মিথ্যা আরোপ, কখনো হাইকোর্টের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছেন, কখনো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছেন। মিডিয়ার প্রাথমিক মনোযোগ পেলেও পরে সত্য জানতে পারছে দেশবাসী। রাফাল বিমান সংক্রান্ত ঘটনাতে কোনও আর্থিক দুর্নীতি হয়নি তা সুপ্রিম কোর্টের রায় জানাচ্ছে। অথচ পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের আগে এই মিথ্যা প্রচার করে কংগ্রেস আশাতীত ভালো ফল করেছে। মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, ভোট নোটায় পড়েছে। তাই কংগ্রেসের ফল ভালো দেখাচ্ছে। কিন্তু কংগ্রেস তার আমলের দুর্নীতি ভুলে গেছে। যে পরিমাণ অর্থ দুর্নীতির জন্য নষ্ট হয়েছে তা যথাযথভাবে খরচ করলে আজ ভারতবর্ষ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দেশ হতো, ধনীতম দেশ হতো, উন্নতির চরম শিখরে থাকত।

কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাস ভুলে ভরা, মিথ্যাচারে ভরা, দুর্নীতিতে ভরা। ষাট বছর একটা রাজনৈতিক দল দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছে প্রতিনিয়ত। দেশের মানুষের টাকায় পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে একটি নির্দিষ্ট পরিবারের। দেশের দারিদ্র খাক না খ'াক, ফুলে ফেঁপে উঠেছে ওই পরিবার। দেশের জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনীতি, সামগ্রিক উন্নয়ন বিসর্জন দেওয়া হয়েছে বারবার। তার জন্য রচনা করা হয়েছে মিথ্যা নাটকের। মিডিয়ার একাংশের সহযোগিতা পেয়ে মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখতে পেরেছিল খুব সহজেই। কিন্তু এখন প্রযুক্তির যুগে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে জনগণের কাছে মিথ্যা বেশিদিন টিকে থাকে না। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার হয়েই যায়। মিথ্যা দিয়ে এই দেশে আর টিকে থাকা সম্ভব নয়, এই স্বাভাবিক সত্য কংগ্রেসের রাজপরিবার যত তাড়াতাড়ি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে, তত তাদের মঙ্গল যত না বেশি, দেশের সার্বিক মঙ্গল অনেক বেশি। ■

রাফাল নিয়ে সংসদে বিতর্কে কংগ্রেসের অনীহা রাহুলের দলের আরেকটা ধাপ্পা

চন্দ্রভানু ঘোষাল

সরকারের কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন প্রশ্ন ওঠে তখন তার উত্তর খোঁজার আদর্শ জায়গা সংসদ। সংসদীয় বিতর্কে সরকার যেমন নিজের কথা বলার সুযোগ পায় বিরোধীরাও সরকারের ভুল কিংবা দুর্নীতি নিয়ে সরব হতে পারে। সংসদীয় বিতর্কের এই প্রক্রিয়া গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। শাসনব্যবস্থা পরিচালনা এবং আইনপ্রণয়নে যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা কখনওই অস্বীকার করা যায় না।

অথচ রাফাল যুদ্ধবিমান কেনা নিয়ে বিতর্কে আমরা এর বিপরীত ছবিটাই দেখতে পাচ্ছি। ২০১৫ সালে শুরু হওয়া এই বিতর্ক নানাস্তর পেরিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়। কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার রায় দিয়ে বলেছেন, রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আদালত কোনও অনিয়ম খুঁজে পায়নি। সুতরাং কংগ্রেসের সভাপতি রাহুল গান্ধী এবং অন্য নেতাদের তৈরি করা রাফাল বিতর্ক ওইখানেই শেষ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তা হয়নি। রাহুল গান্ধীরা আদালতে সরকারের দাখিল করা এভিডেবিটের ভাষায় ব্যাকরণে ভুল খুঁজে পেয়েছেন। তাদের বক্তব্য, ব্যাকরণ ভুলের ফলে সরকারি এভিডেবিটের অর্থ এবং তথ্য দুয়েরই বিকৃতি ঘটেছে। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে ওই 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' এভিডেবিট ভিত্তি করে। অতএব তারা এই রায় মানছেন না। তাদের দাবি, যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করে রাফাল চুক্তির তদন্ত করতে হবে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, অষ্টপ্রহর নিজেদের গণতন্ত্রের রক্ষক বলে জাহির করলেও রাফাল চুক্তি নিয়ে সংসদীয় বিতর্কে অংশ নেওয়ার কোনও ইচ্ছে কংগ্রেসের নেই। তারা বরং বিষয়টি সংসদের এক্তিয়ার থেকে বের করে এনে রাজনীতির পরিসরে রাখার ব্যাপারে বেশি উৎসাহী। মিডিয়ার সাহচর্যে এহেন একপেশে কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে উনিশের ভোটের বাজার আরও গরম করা যাবে বলে তাদের বিশ্বাস। হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্যে নির্বাচনী জয় এই বিশ্বাসকে আরও জোরদার করে তুলেছে।

২০১৫ সালে এই বিতর্কের শুরু। রাফাল চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার কয়েকমাস পর থেকেই রাহুল গান্ধী দুর্নীতির কথা বলতে শুরু করলেন। তার দাবি ছিল, সরকার অবিলম্বে চুক্তিটি জনসমক্ষে প্রকাশ করুক। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল দেশের নিরাপত্তার অজুহাতে সরকার তথ্য গোপন করছে। প্রশ্ন হলো, রাহুল গান্ধী কি জানেন না, তার দল যখন ক্ষমতায় ছিল তখনও একাধিকবার দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত সরকারি চুক্তি প্রকাশ করা হয়নি? ২০০৫ সালের ১৪ ডিসেম্বরের ঘটনা। মার্কিন কোম্পানির কাছ থেকে অস্ত্র কিনতে সরকার কত টাকা খরচ করেছে, জানতে চেয়েছিলেন জ্ঞানেশ্বর মিশ্র। তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অস্ত্রের দাম একটি গোপন বিষয়। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সরকার তা সংসদে প্রকাশ করতে পারে না। এরপর ২০০৭ সালের ২২ আগস্ট। সি পি এমের সাংসদ সীতারাম ইয়েচুরির এক প্রশ্নের উত্তরে তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ. কে. অ্যান্টনি জানিয়েছিলেন, ইজরায়েল থেকে সরকার কত দামে মিসাইল কিনছে বা এর জন্য বাজেটে অর্থবরাদ্দের পরিমাণ কত, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সরকার তা প্রকাশ করতে পারে না। ২০১১ সালের ৯ মে। সেবার এম ৭৭৭ হাউইৎজার কামানের ফিল্ড ট্রায়াল রিপোর্ট ফাঁস হয়ে গেছে। বিজেপির পীযূষ গোয়েল রাজ্যসভায় জানতে চেয়েছিলেন সরকার কোনও তদন্ত কমিটি গঠন করছে কিনা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শুধু বলেছিলেন সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করবে। কিন্তু চাওয়া সত্ত্বেও বিস্তারিত কোনও তথ্য দেননি। কেন? কারণটা সেই দেশের নিরাপত্তা।

রাহুল গান্ধীর অভিযোগ, ইউপিও আমলে প্রস্তাবিত রাফাল চুক্তিতে উল্লেখিত দামের নিরিখে মোদী সরকার অনেক বেশি দামে কিনেছে রাফাল জেট। তিনি আগবাড়িয়ে মোদী সরকারের রাফাল চুক্তিকে ৫৯,০০০ কোটি টাকার কেলেংকারি বলতেও ছাড়েননি। এই বিপুল টাকা নরেন্দ্র মোদী অনিল আম্বানিকে পাইয়ে দিয়েছেন বলে তোপ দেগেছেন। এই অভিযোগের সত্যাসত্য বিচার করার আগে ইউপিএ সরকারের রাফাল চুক্তি নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার। ২০০৭ সালে ইউপিএ সরকার ১২৬টি রাফাল যুদ্ধ বিমান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেবার ভারতীয় অফসেট পার্টনার ছিল হিন্দুস্থান অ্যারোনাটিক্যাল লিমিটেড, সংক্ষেপে হ্যাল। স্থির হয়েছিল ১৮টি

বিমান তৈরি হবে রাফালের মূল নির্মাতা দাসোর ফ্রান্সস্থিত কারখানায়। বাকি ১০৮ টি তৈরি হবে ভারতে, হ্যালের কারখানায়। কিন্তু দাসো পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল তারা শুধু তাদের কারখানায় তৈরি ১৮টি বিমানের উৎকর্ষতার গ্যারান্টি দেবে। হ্যালের প্রযুক্তিগত দক্ষতা নিয়ে তেমন কোনও ধারণা না থাকায় তারা ভারতে (হ্যালের কারখানায়) তৈরি বাকি ১০৮টি বিমানের উৎকর্ষতার কোনও গ্যারান্টি দেবে না। এদিকে সরকারের দাবি দাসোকে ১২৬টি বিমানেরই গ্যারান্টি দিতে হবে। পরবর্তী সাত বছরেও ইউপিএ সরকার এই জট কাটাতে পারেনি। জট কাটল নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর। যাই হোক, এবার দেখা যাক রাফাল জেটের দাম নিয়ে রাহুল যা বলছেন সেটা কতটা সত্যি।

সম্প্রতি রিপাবলিক টিভিতে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ইউপিএ সরকারের করা চুক্তিতে রাফাল জেটের দাম ছিল ১৭০৫ কোটি টাকা। এনডিএ সরকার রাফাল জেট কিনেছে ১৬৪৬ কোটি টাকায়। অর্থাৎ বর্তমান সরকার ৫৯ কোটি টাকা কম খরচ করেছে। ইউপিএ আমলে সর্বমোট খরচ ধরা হয়েছিল ১,৭২,১৮৫ কোটি টাকা। এন ডি এ আমলে খরচ হয়েছে ৫৯, ২৬২ কোটি টাকা। এক্ষেত্রেও বর্তমান সরকার ১,১২,৯৬৩ কোটি টাকা বাঁচাতে পেরেছে। ইউপিএ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী রাফাল জেট ছিল সামরিক পরিভাষায় 'নগ্ন'। অর্থাৎ বিমানে ক্ষেপণাস্ত্র বহন করার উপযোগী পরিকাঠামো ছিল না। এই পরিকাঠামোর জন্য ইউপিএ সরকার ১৫,৮২৩ কোটি টাকা খরচ করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে এনডিএ সরকার খরচ করেছে ৮,৯৫৫ কোটি টাকা। সরকারের লাভ হয়েছে ৬,৮৬৮ কোটি টাকা। প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য ইউপিএ সরকার ১৪,০২৭ কোটি টাকা খরচ ধরেছিল। এনডিএ সরকারের খরচ হয়েছে ৫,৮৯৭ কোটি টাকা। সরকারের লাভ ৮,১৩০ কোটি টাকা। ভারতীয় পরিবেশের উপযোগী কিছু সুযোগসুবিধার জন্য এনডিও সরকার বাড়তি খরচ করেছে ৯,৮৫৫ কোটি টাকা। এর পরেও পার্থক্যটা ৫৯ কোটি টাকার। সুতরাং, নির্দ্বিধায় বলা চলে রাফাল জেটের দাম নিয়ে রাহুল গান্ধী রাজনীতি করছেন। বোকা বানাচ্ছেন দেশের মানুষকে।

রাহুল গান্ধীর অভিযোগ, দাসো অ্যাভিয়েশনের ভারতীয় অফসেট পার্টনার হিসেবে অনিল অম্বানির কোম্পানির নির্বাচন মোদী সরকারের সুপারিশে হয়েছে। ফ্রান্সের

রাফাল চুক্তিতে কোনও বেনিয়ম হয়নি। এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতেও আদালত কোনও ত্রুটি খুঁজে পায়নি।
— সুপ্রিম কোর্ট

রাফালের মতো যুদ্ধ বিমান খুবই প্রয়োজন ছিল। রাফাল ভারতীয় বিমান বাহিনীকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তুলবে।

— বি এস ধানুয়া
বায়ুসেনা প্রধান

রাফাল নিয়ে কোনও অনিয়ম হয়নি। আমরাই বেছে নিয়েছি রিলায়েন্সকে। অযথা রাজনীতির স্বার্থে এটা নিয়ে জলঘোলা করা হচ্ছে।

— এরিক ট্র্যাপিয়ার
সি.ই.ও, দাসো

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ওলাদঁ এই অভিযোগকে রহস্যজনকভাবে সমর্থন করে বলেছিলেন, অফসেট পার্টনার হিসেবে রিলায়েন্সকে বেছে নেওয়া ছাড়া দাসোর আর কোনও উপায় ছিল না কারণ মোদী সরকার রিলায়েন্সের নাম প্রস্তাব করেছিল। কথাটা যে মিথ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই। ফরাসি সরকার বিবৃতি দিয়ে জানায় ওলাদঁ যা বলছেন তা ঠিক নয়। রাফাল চুক্তির কোনও বিষয়েই মোদী সরকার চাপ সৃষ্টি করেনি। দাসো অ্যাভিয়েশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এরিক ট্র্যাপিয়ারও বলেন, আমরাই আম্বানিদের বেছে নিয়েছি। রিলায়েন্স ছাড়া ৩০টি ভারতীয় কোম্পানির প্রস্তাব আমাদের কাছে ছিল। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, রাহুল মিথ্যা কথা বলছেন—একথা জানা সত্ত্বেও ভারতীয় মিডিয়া ক্রমাগত তার কথা দেশেবিদেশে প্রচার করে চলেছে। মানুষের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে যে নরেন্দ্র মোদী চোর। এন ডি এ সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত। সেইসঙ্গে নিপুণভাবে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইউপিএ-র দশ বছরের ইতিহাস।

প্রথম এনডিএ সরকার কুড়ি হাজার কোটি ডলার বিদেশি মুদ্রা রেখে গিয়েছিল। পরের দশ বছরে অর্থাৎ ইউপিএ আমলে দেখলাম ছোটবড়ো ১৮টি আর্থিক কেলেঙ্কারি। টুজি স্পেকট্রাম (২০০৮), সত্যম (২০০৯), কমনওয়েলথ গেমস (২০১০), কোলগেট কেলেংকারি (২০১২), চপার (২০১২), টাট্রা ট্রাক (২০১২), আদর্শ হাউজিং (২০১২)—এসবের কথা মানুষ এখনও ভোলেনি। এর সঙ্গে রয়েছে তেলগি কেলেংকারি, বিমা কেলেঙ্কারি, টেলিকম কেলেংকারি (সুখরাম), ফডার কেলেঙ্কারি, কেতন পারেখ কেলেঙ্কারি, তাজ করিডোর বিতর্ক, অয়েল ফর ফুড বিতর্ক, বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ কেলেঙ্কারি, ৪০০০ কোটি টাকার মানি লন্ডারিং—কত নাম লিখব! এই তালিকা কখনও শেষ হবে না। কারণ কংগ্রেস মানেই দুর্নীতি, চুরি আর সারা দেশজুড়ে অবাধ লুঠতরাজ। অন্যদিকে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে এখনও কোনও দুর্নীতি প্রমাণিত হয়নি। উপরন্তু, সৎ, স্বচ্ছ এবং শূন্য থেকে উঠে আসা লড়াকু নেতা হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর গ্রহণযোগ্যতা দিন-দিন বাড়ছে। আর তাতেই নীলরক্তের উত্তরাধিকারীরা দুঃস্বপ্ন দেখছেন। তাই রাফালে দুর্নীতির নামে পাল্টা দেবার পরিকল্পনা। নরেন্দ্র মোদীকে এবং এনডিএ সরকারকে কাদায় টেনে নামানোর জঘন্য ষড়যন্ত্র।

নরেন্দ্র মোদী অবশ্য জানেন তিনি ঠিক কাদের পাকা ধানে মই দিয়েছেন। সেইজন্যেই বোধহয় তিনি এই কুকথার স্রোতের মধ্যে বাস করেও নির্বিকার থাকতে পারেন। কিন্তু সামনে সাধারণ নির্বাচন। এই সময় এতটা নির্বিকার থাকা বোধহয় উচিত হবে না। যে দেশের জনতার একাংশকে কালো রং ফর্সা হয়ে যাবার লোভ দেখিয়ে বছরের পর বছর ক্রিম বিক্রি করা যায় যেখানে কোনও মিথ্যেই বেশিদিন মিথ্যে থাকে না। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড়ের বিধানসভা নির্বাচনে যার ট্রেলর আমরা সবাই দেখেছি। সুতরাং ধাপ্পাবাজদের এখনই থামানো দরকার। বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, পিকচার আভি বাকি হ্যায় মেরে দোস্ত!

কলকাতায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বিরাট হিন্দু সম্মেলন

গত ১৫ ডিসেম্বর দক্ষিণবঙ্গ হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে এক বিরাট হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতভূষণ সাধ্বী সরস্বতী এবং হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বিহার ক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক ড. সুমন

কুমার। সভায় সভাপতিত্ব করেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গের সভাপতি আশুতোষ মণ্ডল। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন গৌড়ীয় মঠের পূজ্য বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের দক্ষিণবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তুষারকান্তি টিকাদার। পূজ্যা সাধ্বী সরস্বতী তাঁর ভাষণে বলেন, 'দুষ্টের দমনের জন্য দেব-দেবীর হাতে অস্ত্র রয়েছে। হিন্দুত্ব রক্ষায় এবং দুষ্টের দমনের জন্য আজ হিন্দুদের ঘরে ঘরে অস্ত্র রাখার প্রয়োজন রয়েছে।' দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার হিন্দুত্বপ্রেমী মানুষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সোনারপুরে সচেতন নাগরিক মঞ্চের আলোচনা সভা

গত ২৪ নভেম্বর সোনারপুর মায়াভবন প্রেক্ষাগৃহে সচেতন নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি ও নাগরিকত্ব বিল বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন শিক্ষক সৈকত মণ্ডল ও শিক্ষক প্রমথ দাস। বারুইপুর জেলার সংস্কার

ভারতীর সমবেত ভারত বন্দনা ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী। সভায় অধ্যাপক অনুপম বেরা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বিষয়ে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক ও গবেষক পার্থ বিশ্বাস আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন দেশভাগের পরে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অমানবিক অত্যাচার সংগঠিত হয়েছিল। সওয়া এক কোটি অনুপ্রবেশকারী পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতে সরকারি সুযোগ সুবিধা নিয়ে বসবাস করছে। অথচ কেন্দ্র সরকার হিন্দু শরণার্থীদের জন্য যে নাগরিকত্ব বিল তৈরি করেছে— কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল সকলে এক যোগে তার বিরোধিতা করছে। বিশিষ্ট সমাজবিশ্লেষক ও চিন্তাবিদ দেবযানী ভট্টাচার্য নাগরিকত্ব বিলের উপযোগিতা বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং এর সুফল সকল নাগরিকদের বোঝানোর জন্য এই ধরনের আলোচনা সভার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাপ্পা সরদার।

বর্ধমানের ছাতনীতে দম্পতি সম্মেলন

গত ৯ই ডিসেম্বর বর্ধমান জেলার ছাতনী সরস্বতী শিশু মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় পরিবার প্রবোধনের পূর্বস্থলী খণ্ডের দম্পতি সম্মেলন। সম্মেলনে পুরো সময়ের জন্য উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস, পরিবার প্রবোধনের প্রান্তপ্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র ও সদস্য বিনয়ভূষণ দাশ। এলাকার ১৮টি গ্রাম থেকে ১৪৩ জন পতি-পত্নী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালন করেন কাটোয়া জেলা প্রমুখ রণজিৎ বসাক।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

কলামন্দিরে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব

গত ১৬ ডিসেম্বর কলকাতার কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের উদ্যোগে ৩৯তম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে অরুণাচল প্রদেশের নইশি ইন্ডিজেনাস ফেইথ অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির সভাপতি শ্রীপাই দবে তাঁদের পারম্পারিক বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, বিদেশি শক্তি কোনওদিনই ধর্মান্তরণের মাধ্যমে বনবাসী সমাজকে ধ্বংস করতে সফল হবে না। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উপাধ্যক্ষ কৃপা প্রসাদ সিংহ প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশে হিন্দু সমাজ না থাকলে সভ্যতাই নষ্ট হয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা মহানগরের অধ্যক্ষ জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং হাওড়া মহানগরের অধ্যক্ষ শঙ্করলাল হাকিম। সভার শেষ পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতের সনাতন সংস্কৃতি অনুসারে গৃহস্থ জীবনের ষোলোটি সংস্কার নাট্যরূপে পরিবেশিত হয়। সভায় কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ে অরুণ প্রকাশ অবস্থী স্মৃতি সভা

গত ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার অসোয়াল ভবন সভাগারে শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে অরুণ প্রকাশ অবস্থী স্মৃতি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় মঙ্গলাচরণ এবং স্বাগত বক্তব্য রাখন পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন ন্যাশনাল লাইব্রেরির মহানির্দেশক ড. অরুণ কুমার চক্রবর্তী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'পুস্তকালয় ঈশ্বরের স্বরূপ। পুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম। ইন্টারনেট পুস্তকের বিকল্প হতে পারে না। সেজন্য খুব মনোযোগ সহকারে পুস্তক পড়া উচিত।' সভায় প্রধান বক্তারূপে শ্রীমতী মৃদুলা পণ্ডিত এবং বিশেষ অতিথিরূপে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের কলকাতার স্থানীয় আধিকারিক ব্রতীন দে উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রখ্যাত গজলকার নন্দলাল রৌশন গজল পরিবেশন করেন। ড. তারা দুগড় অবস্থীজীর রচনা থেকে আবৃত্তি করেন। সভা পরিচালনা করেন শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা। অনুষ্ঠানে বহু পুস্তকপ্রেমী উপস্থিত ছিলেন।

মাহেশ্বরী ঔদ্যোগিক শিক্ষণ কেন্দ্রের সভা

গত ১৬ ডিসেম্বর হাওড়া জেলার ধুলাগড় ফ্লাওয়ার মিলে কলকাতার মাহেশ্বরী সভার অন্তর্গত মাহেশ্বরী ঔদ্যোগিক শিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট অ্যান্ড উইন্টার কার্নিভাল কাম ফ্যামিলি গেট টুগেদার'-এর আয়োজন করা হয়। পারিবারিক এই মিলনে মাহেশ্বরী সভার সভাপতি তথা বিশিষ্ট শিল্পপতি পুরুষোত্তম মিমানী বলেন, অন্ন হলো দেবতা, তাই কোনওমতেই অন্ন নষ্ট

করা উচিত নয়। তিনি আটা মিলে ঘুরে ঘুরে গম থেকে কীভাবে আটা, দালিয়া, ময়দা তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। শিক্ষণ কেন্দ্রের সভাপতি ডি কে মেহতা বলেন, শিল্প পরিদর্শন কেবল দেখামাত্র নয়, যুব প্রজন্মকে শিল্পপতি বানানোর জন্য সহযোগিতা করা এবং প্রেরণা দেওয়া। সংস্থার সম্পাদক অরুণ কুমার সোনী মাহেশ্বরী ঔদ্যোগিক কেন্দ্রের বিভিন্ন উদ্যোগের বিস্তারিত বর্ণনা করেন। যেমন, মাস্ক বিজনেস ফোরাম, ই-পত্রিকা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পঞ্চানন ভট্টর এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আদিত্য বিনানী।

সিভিল রাইট ডিফেন্ডারের আলোচনা সভা

গত ১০ ডিসেম্বর কলকাতায় সুবর্ণবণিক সমাজ হলে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে 'সিভিল রাইট ডিফেন্ডারস' এবং 'বি-ওয়াচ' ও 'সিটিজেন্স ফর জাস্টিস' নামে দুটি সংস্থা এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কথা সাহিত্যিক অধ্যাপিকা এষা দে, আই এ এস ড. দিশারি শ্রীনিবাসিলু, কলকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী ফিরোজ এডুজি ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নির্মাল্য রায় চৌধুরী। উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে বলেন ডাঃ রায় চৌধুরী। মানবাধিকারের

উপর মনুষ্যত্বের কথা বলেন ড. শ্রীনিবাসিলু। আইনি দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবাধিকারের কথা বলেছেন শ্রী এডুলজী আর নকল মানবাধিকার কর্মীদের মুখোশ খুলে দেন অধ্যাপিকা দে। অধ্যাপিকা দে এদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু হত্যা করেছিল সাম্প্রদায়িক ইসলামিক শক্তি, দেড় কোটি হিন্দুকে ভিটেমাটি উৎখাত করে ছেড়েছিল তারা; তা নিয়ে তথাকথিত মানবাধিকার কর্মীরা বিন্দুমাত্র চোখের জলও ফেলে না। বরং রোহিঙ্গাদের হিন্দু ও বৌদ্ধ হত্যাকাণ্ডকে আড়াল করে তাদের মানবাধিকার নিয়েই সোচ্চার হয় এই ভণ্ড কর্মীরা। তাদের দোসর হলো সাম্প্রদায়িক মিডিয়া যারা অকারণ হিন্দু হত্যাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলেই মনে করে না। অধাপিকা দে আরও বলেন, এই দালাল শ্রেণীর মিডিয়া আর ভুয়ো মানবাধিকার কর্মীদের মুখোশ আজ টেনে খুলে দিতে হবে। এই নকল কর্মীদের বাজার যেন বন্ধ হয়। এদিনের সভা সঞ্চালনা করেন ড. পার্থ বিশ্বাস। তিনি টুকরো টুকরো মন্তব্যে দাড়িভিটের মানবাধিকার লঙ্ঘন, বাংলাদেশে ষোড়শী অসহায় পূর্ণিমা শীলের উপর জেহাদি মুসলমানদের বর্বরোচিত গণধর্ষণের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবার কথা বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আইনজীবী কুন্তল ঘোষ।

লোকপ্রজ্ঞা দক্ষিণবঙ্গের আলোচনা সভা

গত ১৬ ডিসেম্বর উত্তর কলকাতার বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরির সভাগৃহে প্রজ্ঞা প্রবাহের দক্ষিণবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞা এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' বেদমন্ত্র দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। প্রধন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার এবং তাপস সরকার। সভায় প্রজ্ঞা প্রবাহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দান করেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ উচ্ছল ভদ্র। হিন্দুশাস্ত্র ও শাস্ত্রপাঠের উপযোগিতা সম্পর্কে প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন ড. সরকার। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান পরম্পরা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন তাপস সরকার। সভা পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট সঞ্জয় ঘোষ। ধন্যবাদ জ্ঞানপন করেন লোক প্রজ্ঞার উত্তর কলকতার সংযোজক মহিম দাস। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

শতাব্দীর কল্পতরু

নন্দলাল ভট্টাচার্য

কালের চাকা ঘুরছে।

ঘুরছে দিন। ঘুরছে রাত্রি। ঘুরছে জীবন। ঘুরছে মৃত্যু।

ঘুরছ তুমি, ঘুরছি আমি। স্থির শুধু সেই সত্য— সেই ব্রহ্ম। স্থির শুধু তিনি। সর্বভূতেই তিনি— সর্ব চরাচরে— তিনি আদি— তিনি অনন্ত— তিনি অক্ষয়— অদ্বয়। তিনিই ঈশ্বর।

ঈশ্বর পরলোকের অছি। ঈশ্বর কল্পতরু। যে যা চায়, তাই পায়। ভক্তের নৈবেদ্য— ভক্তের নিমন্ত্রণ— ভক্ত সঙ্গে বিহার তাঁর প্রিয়। তাই তো ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু তিনি। ভক্তের আহ্বানে তাঁর এই মর্ত্যবিহার। ভক্তের আশা মেটাতেই নিত্য নব-নব রূপ ধারণ। ভক্তকে কৃপা করতেই নানা লীলার প্রকাশ।

এমনই এক লীলা প্রকাশে আবির্ভাব তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে। সেই রূপেতেই তিনি সদা কৃপাপরায়ণ। জীবনে তো বটেই, মরণেরও পরে। কৃপা তাঁর সর্বজীবে— সর্বভূতে। সেই লীলা-ভাবতরঙ্গেরই এক বিভক্ত প্রকাশ ঘটল সেদিন।

কালের বুকে চিহ্নিত সেই লীলা প্রকাশের শুভক্ষণ ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারি অপরাহ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলার সে এক অমৃতমুহূর্ত।

গলরোগে আক্রান্ত রামকৃষ্ণ তখন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে চিকিৎসারত। রোগ প্রায় চরমসীমায়। উদ্বেগে আকুল ভক্তকুল রয়েছেন তাঁকে ঘিরে। রয়েছেন আগামীর বীর সন্ন্যাসী সব তাঁর মানস সন্তান। রয়েছেন গৃহীভক্তরাও।

সময় তখন বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে। অসুস্থ ঠাকুর হঠাৎই সুস্থ। অতি সুস্থ। শুরু হলো তাঁর হাঁকডাক— ওরে কোথায়— আমার কাপড়, আমার পিরান, আমার টুপি। নিয়ে আয় সব। আজ আমি প্রকাশিত হব নববেশে। আজ যে আমার নবভাব প্রকাশের সময় এসেছে। আজ আমি হব কল্পবৃক্ষ।

সাজলেন তিনি। লালপেড়ে কাপড় পরনে। গায়ে পিরান, লালপেড়ে চাদর। কানঢাকা টুপি দিলেন মাথায়। পায়ে মোজা, চামড়ার চটি।

এ যেন তাঁর মোহন বেশ। নিজের এই রূপ নিজেই দেখলেন বহুক্ষণ ধরে। কিংবা এতক্ষণ যাঁরা সাজালেন তাঁকে, তাঁদেরই সেই রূপ দেখাতে তাঁর এই লীলাভিনয়।

এবার আমি নীচে যাব। বাগানে বেড়াব।

কিন্তু আপনি যে অসুস্থ। দুর্বল। কেমন করে যাবেন।

না, আজ আমি সুস্থ। সম্পূর্ণ সুস্থ। আজ আমি অবারিত। সদাব্রত। আজ আমি উদার— উন্মুক্ত। আজ আর কোনো বাধা নয়!

দোতলা থেকে নামছেন তিনি। সঙ্গে লাটু। একতলায় নামলেন তিনি স্বাভাবিকতার পথে— সাধারণ যাঁরা— যাঁরা থাকতে চান গৃহেই— সেই গৃহী ভক্তদের কাছে।

নীচের ঘরে তখন কিছু গৃহী ভক্ত। আরও কিছু বাইরে বাগানে। অকস্মাৎই ঠাকুরকে নীচে দেখে উল্লসিত সকলেই। সঙ্গ নিলেন তাঁরা তাঁদের ঠাকুরের। তা দেখে লাটু ফিরে গেলেন ওপরে। সেখানে যে তাঁর অনেক কাজ।

ঠাকুরকে ঘিরে গৃহী ভক্তের দল। তাঁরা দেখছেন তাঁদের আরাধ্যকে। যেন দেদীপ্যমান অগ্নিশিখা। দেখছেন অকলঙ্ক এক চন্দ্রকে। দেখছেন অতলান্ত— অসীম সমুদ্রকে, দেখছেন সুবিশাল এক শেষাদ্রিকে। দেখছেন আশ্চর্য শীতল এক পাবককে।

কে উনি?

মৃত্যুর মুখেও অমৃত।

অন্ধকারে আলো। যন্ত্রণার মুহূর্তেও হাস্যময়!

দেখছেন তাঁরা। অভিভূত তাঁরা। ওই বিরাট— ওই বিশালকে দর্শন করতে গিয়ে বারেবারে মন হয় সন্ত্রস্ত-সচকিত। হয় সঙ্কুচিত, আবার উন্মুক্ত।

নীরব সরব আকুতি সকলের— তোমাকে বোঝার, তোমাকে জানার, তোমাকে ধারণ করার শক্তি দাও। নয়ন দাও আমাদের তোমাকে দেখার।

স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ পদবিক্ষেপে এগিয়ে আসছেন তিনি। নীচের হলঘরের পশ্চিম দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এগিয়ে চললেন দক্ষিণের ফটকের দিকে।

প্রায় মাঝামাঝি এসে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেন, পশ্চিমে গাছের তলায় বসে আছেন গিরিশ, রাম, অতুল প্রভৃতি কয়েকজন। তাঁকে দেখেই এগিয়ে এলেন তাঁরা। হলেন অবনত।

সহসা স্ফুরিত হলো শ্রীরামকৃষ্ণ অধর থেকে দুটি কথা,— গিরিশ, তুমি সবাইকে বলে বেড়াও, আমি নাকি অবতার। আমি বিরাট— এইরকম আরও কত কী? কিন্তু আমার কী দেখেছ তুমি ? কী বুঝেছ তুমি আমার?

প্রশ্ন তো নয়— যেন আত্মপ্রকাশের দুর্জয় নির্ঘোষ। সেই ধ্বনির অনুরণনে স্তব্ধ সকলে। কিন্তু চরণে অবনত গিরিশ— বিচলিত নন এতটুকু। কোনও চিন্তা নয়, আর নয় কোনও ভাবনা। কোনও

কৈফিয়তের স্বর নয়। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

গদগদ কণ্ঠে বলে উঠলেন গিরিশ— ব্যাস, বাল্মীকি পায়নি যাঁর অন্ত, আমি তাঁর সম্বন্ধে বেশি কী বলতে পারি?

গিরিশের এ উত্তরে ভবগম্ভীর রামকৃষ্ণ। উচ্চভূমে হলো তাঁর অবস্থান। তিনি হলেন সমাধিস্থ। দেবভাবে প্রদীপ্ত তখন তাঁর বদনমণ্ডল। তাঁর সে রূপ দেখে ভক্তিতে, আবেগে, উল্লাসে উচ্চকিত গিরিশ বারবার বলে উঠলেন,— 'জয় রামকৃষ্ণের জয়, জয় রামকৃষ্ণের জয়।' সেই ধ্বনিতে সুর মেলালেন উপস্থিত ভক্তের দল।

মা জাগো, মা জাগো বলে হাত তুললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্ধবাহ্যদশায় মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো বাণী, তোমাদের আর কী বলবো? আশীর্বাদ করি, তোমাদের চৈতন্য হোক!

মুহূর্তে চারিদিক যেন চৈতন্যময়। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সকলেই চৈতন্যময় হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তখন আকুল। ভাববিহ্বল সেই ভক্তরা তাঁকে প্রণাম করেন, পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেন আর আগের সব প্রতিজ্ঞা ভুলে লুটিয়ে পড়ে বুকে টেনে নেন তাঁর পদযুগল।

তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাঁদের প্রাণের ঠাকুর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত স্পর্শ করবেন না তাঁকে। তাঁদের পাপ যাতে আর ঠাকুর নিজের দেহে টেনে নিতে না পারেন, তারই জন্য ওই প্রতিজ্ঞা। কিন্তু ইংরেজির নববর্ষের এই অপরাহ্নে সব যেন বিস্মরণ হলো। সেই মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই তাঁরা দেখতে থাকেন নিজেদের ইষ্টদেবতাকে। ইষ্টদর্শনের সেই দিব্যক্ষণে সব সাধনের পরম সিদ্ধিকে পেয়ে কী আর মনে রাখা যায় ওসব প্রতিজ্ঞা? তাই তাঁরা অবনত সেই পরম-নির্ভর চরণতলে।

সেদিনের সেই পরম মুহূর্তে রামলাল দেখেন, যে ইষ্টকে তিনি সম্পূর্ণরূপে দেখেননি কখনও, তাঁর চরণ দেখলে আনন থাকে দৃষ্টির বাইরে, কিংবা মুখ দেখলে অগোচরে থাকে পদযুগল— সেই ইষ্ট আজ পরিপূর্ণভাবে প্রতিভাত তাঁরই নয়ন সম্মুখে।

রাম দত্ত দু'হাত ভরে সে রাঙা চরণে অঞ্জলি দিলেন। আর ঠাকুরের কণ্ঠে স্ফুরিত হলো সেই অমৃত বাক্য, চৈতন্য হোক!

অক্ষয় সেন দিলেন দু'টি জহুরি চাঁপা। তাঁরও বক্ষ স্পর্শ করে বললেন, চৈতন্য হোক!

বেলেঘাটার হারান দাসের মাথায় রাখলেন শ্রীচরণ। কৃপা বিতরণে সেদিন যে কল্পতরু তিনি।

তাঁর সে ভাব দর্শনে উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন অক্ষয় সেন। ওরে কে কোথায় আছিস আয়— মুঠো মুঠো অভয় কুড়িয়ে নে ভারে ভারে। জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, —যার যা খুশি নিয়ে যা। ওরে ঠাকুর আমাদের কল্পতরু হয়েছেন! কল্পতরু! এমন দিন আর পাবি না রে। ওরে আয়— আয়!

এগিয়ে আসেন বৈকুণ্ঠ সান্যাল। আমাকে কৃপা করুন। স্পর্শ করুন আমাকে।

তোমার তো সব হয়েই গেছে।

আপনি যখন বলছেন, তখন হয়ে গেছে তাতে ভুল কী! তবু অল্পবিস্তর যাতে একটু বুঝতে পারি তার ব্যবস্থা করে দিন।

এগিয়ে এলেন বৈকুণ্ঠ। তিনি স্পর্শ করলেন তাঁর বুক।

সঙ্গে সঙ্গে একী— একী বিরাট— একী অনন্ত— একী সুন্দর— এ কী ভয়ংকর। সর্বত্রই যে তুমি— প্রভু আমার! এই মহাজগৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবই যে শ্রীরামকৃষ্ণময়। প্রভু তোমার ওই বিরাট-বিশাল রূপ সম্বরণ কর! হৃদয় যে আমার দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমি আর সইতে পারছি না।

একদিন-দু'দিন নয়, তিন তিন দিন ওই ভাবেই কাটল বৈকুণ্ঠের। শুধু রব— ওরে কে কোথায় আছিস আয়। অমৃতময়কে স্পর্শ করে ধন্য হ' সবাই।

নবগোপাল, অতুল, হরমোহন, কিশোরী— সকলকেই স্পর্শ করলেন তিনি। সেদিন যেখানে পশুপাখি, গাছপাতা যা ছিল সবই যেন মুখর শ্রীরামকৃষ্ণের জয়ধ্বনিতে। চারিদিকে শুধু ডাক— আয়, আয়, নিয়ে যা ঠাকুর আমাদের কল্পতরু— শতাব্দীর পর শতাব্দী ছড়িয়ে পড়বে এঁর করুণা— আজ এঁকে দর্শন করে, স্পর্শ করে ধন্য হ'।

সেদিন রামকৃষ্ণের যাঁরা সন্ন্যাসী ভক্ত তাঁরা কিন্তু এলেন না একজনও। বরং এই অবসরে মনের উল্লাসে, ভক্তির আবেশে গোছাতে লাগলেন ঠাকুরের ঘর। পরিপাটি করে পাততে লাগলেন তাঁর বিছানা। সেবার মধ্য দিয়ে আরও নিবিড়ভাবে— আরও কঠিন পাকে বাঁধতে লাগলেন তাঁদের জীবনদাতাকে।

সে এক ছিন্নমস্তা সময়। উনিশ শতকের চলচঞ্চল সেই সময়ে মানুষ দিশাহীন। ইতি-নেতির নানা দ্বন্দ্বে দ্বিধায় দীর্ণ মানুষ। পথ নেই। পথের সন্ধান যেন অন্ধকার ঘরে ছুঁচ খোঁজার মতোই। তাই দোলাচলে সকলে। এমনই সময় এলেন তিনি বৃক্ষ হয়ে। মহাদ্রুম। তাপিত-তৃষিত জনকে আশ্রয় দিতে, তাদের তৃষ্ণা মেটাতে আবির্ভাব তাঁর। সকলের সব চাওয়ার অবসান ঘটাতে, সকলকে উদ্ধার করতে তিনি হলেন কল্পতরু। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

সমুদ্রমন্থনের সময় উত্থিত এক দেবতরু— কল্পবৃক্ষ তার নাম। সকলের সব অভীষ্ট পূরণে সদা-উদার সে তরু। কল্পকাল ধরে সে তরু একইভাবে দানব্রতী।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাই। সকলের সব বাসনা পূরণে হলেন তিনি কল্পতরু। তাঁর চিহ্নিত সন্ন্যাসী যেসব সন্তান,— তাঁদের তো দিয়েছেন তিনি উজাড় করে। কিন্তু গৃহী যারা, সংসারের চাকায় নিত্য পাক খাচ্ছে যারা, তাদেরও দিলেন তিনি এবার দু'হাত ভরে। বেলা অবসানের প্রাক্‌মুহূর্তে সকলকে চৈতন্যময় করলেন। পূরণ করলেন তাদের সব চাওয়া, শুধু সেদিন নয়, আজও তিনি সেই একই ভাবে, একই ধারায় ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু। আজও তাপিতজনের পরম আশ্রয় তিনি। আজও দেবতরু হয়েই তৃষিতজনের তৃষ্ণ-তারণ। সদা ভাস্বর তিনি জ্যোতির্ময়— কল্পতরু। ■

কথামৃত ও কথামৃতকার শ্রীম

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভাইদের দুর্দিনের প্রকৃত বন্ধু

চিন্ময় সেনগুপ্ত

‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’ (১ম—৫ম ভাগ)-এর রচয়িতা হিসেবেই শ্রীম বা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের জগৎজোড়া খ্যাতি। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে শ্রীম তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত কথাগুলিকে সংগ্রথিত করে এই অপূর্ব গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছিলেন। নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে অন্য কারো কথোপকথন সঠিকভাবে অনুলিখন করা যেমন প্রয়াসসাধ্য তেমনি বিস্ময়কর। এই আঙ্গিকে আজ পর্যন্ত আর কোনো আধ্যাত্মিক বা ধর্মগ্রন্থ লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ। তাই ‘কথামৃত’ সবার্থেই অতুলনীয়।

‘কথামৃত’ কিন্তু প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজি ভাষায়। একদিন শ্রীমা সারদামণিকে শ্রীম তাঁর লিপিবদ্ধ দিনলিপিগুলি শোনালে শ্রীমা অত্যন্ত খুশি হয়ে রচনাগুলি পুস্তকের আকারে প্রকাশ করতে শ্রীম-কে নির্দেশ দেন। সেই আদেশকে মান্যতা দিয়ে ‘কথামৃত’ প্রথম প্রকাশিত হয় ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে Gospel of Sri Ramakrishna (According to M, a Son of the Lord and disciple) হিসেবে, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে।

ইংরেজিতে লেখা এই Gospel প্রকাশিত হলে স্বামী বিবেকানন্দ সহ সকলেই বইটির অজস্র প্রশংসা করেন এবং আরও উপদেশ প্রকাশের জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন। তবে এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্ত তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ, ১৩০৪) শ্রীম-র এই প্রচেষ্টাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে এই মহামূল্যবান উপদেশে ভরা রচনা বাংলাভাষায় প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন। তখন বাংলা ভাষায় ‘কথামৃত’ রচনা আরম্ভ হয়। অতঃপর ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম কথিত’ এই শিরোনামে শ্রীম-র রচনা তৎকালীন বিভিন্ন জনপ্রিয় পত্রিকা---বঙ্গদর্শন, তত্ত্বমঞ্জরী, হিন্দু প্রভৃতিতে প্রকাশিত হতে থাকে। পরে ওই লেখাগুলিকে একত্র করে ১৯০২ সালে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের প্রকাশনায় উদ্বোধন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম কথিত’ গ্রন্থের প্রথম ভাগ। পরে ১৯০৪ সালে দ্বিতীয় ভাগ, ১৯০৮ সালে তৃতীয় ভাগ, ১৯১০ সালে চতুর্থ ভাগ এবং এর বেশ কিছুকাল পর ১৯৩২ সালে পঞ্চম ভাগ প্রকাশিত হয়।

শ্রীম দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন লাভ করেন ১৮৮২ সালে। সেই থেকে ১৮৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পূর্ব পর্যন্ত ১৭৪টি সাক্ষাৎকারের অনবদ্য বিবরণ আমরা লাভ করেছি শ্রীম কথিত এই পাঁচ ভাগ কথামৃতের মাধ্যমে।

‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’ রচনাই শ্রীম-র জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতবাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে

কথামৃতের যে অমূল্য অবদান সে সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই ধারণা রয়েছে। কিন্তু শ্রীম-র এই সৃজনকর্মকে একদিকে রেখে যখন শ্রীম মানুষটির দিকে তাকাই তখন যেন বিস্ময়ের সীমা থাকে না। স্বামী বিবেকানন্দ এমনকি তাঁর গুরুভাইদের নানা প্রয়োজনে, দুর্দিনে, দুঃসময়ে শ্রীম যেভাবে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তার খবর জানলে অভিভূত হতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের কোনো কিছুর প্রয়োজন হলেই তিনি শ্রীম-কে তা বলতেন। এইসঙ্গে বলতেন—'সকলের জিনিস গ্রহণ করতে পারি না।'

শ্রীমা সারদামণির প্রতি প্রথম থেকেই শ্রীম-র ছিল অবিচলিত নিষ্ঠা ভক্তি। এর ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর বহুবার তিনি শ্রীমা-কে তাঁর নিজের বাড়িতে এনে রেখে তাঁর সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। শ্রীমা কখনও একমাস কখনো মাসাধিক কাল শ্রীম-র বাড়িতে গিয়ে থেকেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন স্বপ্নে শ্রীমাকে শ্রীমর বাড়িতে ঘট প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দেন, তখন শ্রীমা গিয়ে নিজের হাতে ঘট-স্থাপন এবং পূজার ব্যবস্থা করেন। কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের ঠনঠনিয়া এলাকায় বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে শ্রীম-র বসতবাড়ি তখন থেকেই 'ঠাকুর বাড়ি' নামে পরিচিত এবং প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৮৮৯ সাল থেকে শ্রীমায়ের সেবার জন্য প্রতিমাসে শ্রীম নিয়মিত টাকা পাঠাতেন। শ্রীমা-ও কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে শ্রীমকেই তা জানাতেন। জগদ্ধাত্রী পূজার জন্য জমি কিনবার সময় শ্রীমা শ্রীম-কে আদেশ করেছিলেন জমি কিনবার টাকা পাঠাতে। মাতৃভক্ত শ্রীম-ও পত্রপাঠ ৩২০ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া দেশে জলকষ্ট দেখা দিলে শ্রীম মায়ের আদেশে কুয়ো খোঁড়ার জন্য টাকা পাঠিয়েছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথের (শ্রীম) মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক প্রগাঢ় প্রীতিময় সম্পর্ক। অনেকের মতোই নরেন্দ্রনাথ তাঁকে 'মাস্টার' বলে সম্বোধন করতেন।

বাবার মৃত্যুর পর নরেন্দ্রনাথ সপরিবারে নিদারুণ অর্থ-সংকটের সম্মুখীন হন। তাঁদের পরিবারে অন্নকষ্ট দেখা দিলে শ্রীম নিজে যোগাযোগ করে নরেন্দ্রনাথকে মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ জোগাড় করে দেন। শুধু তাই নয়, সংসারের আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়ে যাতে নরেন্দ্রনাথের সাধনার ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য নরেন্দ্রের পরিবারের তিন মাসের ব্যয়ভার বহন করে শ্রীম তাঁকে নিশ্চিত মনে সাধনা করবার সুযোগ করে দেন। এছাড়া মাঝে মধ্যেই নরেন্দ্রনাথের মায়ের কাছে গোপনে টাকা দিতে গিয়ে প্রতিবারই শ্রীম তাঁকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করে আসতেন যে এই বিষয়ে কোনোভাবেই যেন নরেন্দ্রনাথকে না জানানো হয়। কেননা জানতে পারলে নরেন্দ্রনাথ আবার সেই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য আরেক সমস্যার মধ্যে পড়বেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যখন তাঁর যুবক ভক্তেরা সহায় সম্বলহীন কপর্দকশূন্য তখন যে দু-চারজন গৃহীভক্তেরা সেই দুর্দিনে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে অর্থ এবং সুপরামর্শ দিয়ে বরানগর মঠের সংগঠনটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন শ্রীম ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সেই সময় দুটি জায়গায় অধ্যাপনা করতেন শ্রীম। তারমধ্যে এক জায়গার সম্পূর্ণ উপার্জন তিনি মঠের খরচের জন্য দিয়ে দিতেন। ছুটির দিনেও তিনি প্রায়ই মঠে এসে রাত্রিযাপন করতেন আর নানাভাবে অনুপ্রাণিত করতেন তাঁর গুরুভাইদের। সাধন-ভজন করার জন্য তাঁরা পাহাড়ে বা দূরে কোথাও গেলেও শ্রীম তাঁদের অর্থ পাঠিয়ে সাহায্য করতেন। একথা নানাভাবে জানা গেছে যে শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রিত ভক্তদের সাহায্যার্থে এবং তপস্যারত সাধুদের অভাব মেটানোর জন্য শ্রীম গুপ্তভাবে বহু অর্থ ব্যয় করতেন। যদিও এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তবু মনে হয় তাঁর মতো একজন মধ্যবিত্ত অধ্যাপকের পক্ষে সেই অনুদানের পরিমাণ নেহাত কম ছিল না।

এইসব কথা মনে করে স্বামী বিবেকানন্দ পরে একটি পত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন, 'রাখাল, ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মনে আছে, সকলে আমাদের ত্যাগ করে দিলে—হাবাতে মনে করে? কেবল বলরাম, সুরেশ, মাস্টার (শ্রীম) ও চুনীবাবু—এঁরা সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু। অতএব এঁদের ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করতে পারব না।'

একটু গভীর করে ভাবলেই বুঝতে পারা যায় শ্রীম-র এই যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিবারের সকলের সংকটে সমস্যায় পাশে থাকা এবং সাধ্যমত তাঁদের সাহায্য করা এবং সবকিছুই করা অত্যন্ত গোপনে এবং গুপ্তভাবে। এই অন্তরঙ্গতার, এই অনুপম মহানুভবতার পিছনে ছিল একটি সুগভীর অভিপ্রায়। সকলকেই শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনের সাধনায় সদর্থে অনুপ্রাণিত করতে চাইতেন তিনি। সেই সাধনপথে কখনও কোনো বিঘ্ন ঘটে এটা শ্রীম মেনে নিতে পারতেন না। এ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমনকি বিদেশ থেকেও বহু ভক্তের সমাগম হত শ্রীম-র বাড়িতে। তিনি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একমাত্র তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই তাঁদের শুনিয়ে অনুপ্রাণিত করতেন। এমন প্রাণস্পর্শী ও দরদপূর্ণভাবে শ্রীম বলতেন, যেন মনে হত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসেই সকলে সব শুনছেন। শ্রীম বলতেন—

I am insignificant person, but I live by the side of an ocean, and I keep wih me a few pitchers of sea water. When a visitor comes, I entertain him with that. What else can I speak of but His words?

বিশ্ববন্দিত দার্শনিক তথা যোগী পরমহংস যোগানন্দ একসময় ছিলেন শ্রীম-র ছাত্র। তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ অধ্যাত্ম জীবনলাভের প্রথমাবস্থায় শ্রীম-র কাছে চিরকাল অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন সে বিষয়ে তিনি লিখে গেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Autobiography of a Yogi গ্রন্থে সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় জুড়ে। শ্রীম-র প্রতি পরমহংস যোগানন্দের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভক্তি এতটাই সুগভীর ছিল যে তিনি লিখছেন—

I would roll on the ground where
he'd walked, so great was my
love for him.
I felt that even that ground had
been sanctified.'

বিশেষ প্রবন্ধ

মার্ক্সবাদের ভোলবদল

বুদ্ধিজীবীর দাপটে সর্বহারার নাভিশ্বাস

অ্যান্টনি পি. মুলার

নব্য মার্ক্সবাদের যে রূপটি আমেরিকায় এখন সব থেকে বেশি জনপ্রিয়, সেটি হলো সাংস্কৃতিক মার্ক্সবাদ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজ বিপ্লবের চালিকাশক্তি সর্বহারা শ্রমিক নয়, বুদ্ধিজীবীরা। যেহেতু সারা বিশ্বে শ্রমিক আন্দোলন থেকে মার্ক্সবাদ কার্যত বিদায় নিয়েছে, তাই মার্ক্সীয় তত্ত্বের চর্চা এখন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, তাত্ত্বিকদের দুনিয়া এবং গণমাধ্যমের পরিসরে সীমাবদ্ধ। এই সাংস্কৃতিক মার্ক্সবাদের প্রবক্তা অ্যান্টোনিও গ্রামসি (১৮৯১—১৯৩৭) এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল। মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকেরা এখন খোলাখুলি স্বীকার করেন, সারা বিশ্বে বিপ্লব সংগঠনের কাজে সর্বহারা শ্রেণী কোনওদিনই তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করবে না। সুতরাং বিপ্লবকে সফল করে তুলতে হলে সাংস্কৃতিক জগতের মধ্যমণিদের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। একমাত্র তারাই সারা বিশ্বে খ্রিস্ট ধর্মানুসারী সংস্কৃতি ও নীতিবোধকে ধ্বংস করে আত্মপরিচয়হীন মানুষগুলোকে বাধ্য করতে পারে কমিউনিজমকে তাদের নতুন মত ও ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করতে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য সারা বিশ্বে এমন একটি শাসনব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকেরাই শেষ কথা বলবেন। এই দিক থেকে বিচার করলে সাংস্কৃতিক মার্ক্সবাদকে রুশ বিপ্লবের ধারাবাহিক পরিণতি বলা যেতে পারে।

লেনিনের নেতৃত্বে সংগঠিত বলশেভিক বিপ্লবের অন্য প্রবক্তারা ভেবেছিলেন রাশিয়ায় তাদের সাফল্য বিশ্ববিপ্লবের প্রথম ধাপ। যদিও এই বিপ্লব তার চরিত্রে রাশিয়ান তো ছিলই না, সর্বহারার বিপ্লবও ছিল না। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় মানুষের প্রধান পেশা ছিল কৃষিকাজ। শ্রমিকরা ছিলেন সংখ্যায় কম। রুশবিপ্লবকে সম্মিলিত প্রয়াস বলাই ভালো। বলশেভিক পার্টি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম সরকারের গঠনতন্ত্র ও নানা অপরাধমূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা করলেই রুশবিপ্লবের প্রকৃত চরিত্র বোঝা যাবে। আরও বোঝা যাবে অত্যাচারী জারের কঠোর ও নির্মম শাসন থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিপ্লবের উপযোগী জমি প্রস্তুত করা।

মার্ক্সীয় তত্ত্বে সর্বহারা শ্রেণীকে বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি বলা হয়। এটা একটা ভাঁওতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী কিছু ঘটনা পর্যালোচনা করলে তা বোঝা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলেও বোঝা যায়, একনায়কত্ব ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্র বেঁচে থাকতে পারে না। মার্ক্সীয় তাত্ত্বিকেরাও এসব জানেন। তাই তাঁরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য পৃথক রণকৌশল রচনায় ব্যস্ত। কমিউনিস্ট লেখকেরা সারা বিশ্বে একটা ধারণা ছড়িয়ে দিতে চাইছেন যে, সারা বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ আবার ফিরে আসবে কিন্তু তা আসবে ছদ্মবেশে। তবে সমাজতন্ত্রকে পুরোপুরি কায়েম করতে চাইলে সনাতন সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হবে। এবং সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণই একদিন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পথ প্রশস্ত করে দেবে।

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করার নামে বহু দেশে নব্য মার্ক্সবাদীরা ব্যক্তিস্বাধীনতার টোপ দিয়ে সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই করছেন। বিগত কয়েক দশক জুড়ে আমেরিকায় রাজনৈতিক শুদ্ধতাবাদীদের প্রভাব বেড়েছে। আমেরিকার সরকারও কয়েক দফায় দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ফলত, আমেরিকানদের একটা বেশ বড়ো অংশ মনে করে জর্জ ডবলিউ বুশের আমলে অর্থাৎ ২০০১ সালে চালু হওয়া জরুরি অবস্থা এখনও সে দেশে চলছে। আমাদের মনে আছে, ওই ২০০১ সালেই আল কায়দার সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন সরকার দেশপ্রেমিক আইন (প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট) প্রণয়ন করে। উদ্দেশ্য, আমেরিকার সাধারণ নাগরিকদের

স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে উদ্বুদ্ধ করা। অথচ, এই ২০১৮ সালে, ফ্রিডম হাউস প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকার সাধারণ নাগরিকদের স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্ক্ষার সূচক ৯৫ পয়েন্ট থেকে কমে হয়েছে ৮৬ পয়েন্ট।

সাংস্কৃতিক মার্ক্সবাদীদের প্রস্তাবিত দুনিয়ায় পা রাখার একটাই উপায়—ব্যক্তিমানুষের নৈতিক অবক্ষয়। এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য গণমাধ্যম এবং গণশিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমাগত মানুষকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর এখন প্রধান কাজই হলো সমাজের এক অংশের বিরুদ্ধে অন্য অংশকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। যেহেতু সারা বিশ্বেই মানুষের ব্যক্তিপরিচয়ের থেকে গোষ্ঠীপরিচয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই লেখা হচ্ছে অত্যাচারের দীর্ঘ ইতিহাস। একবার 'অত্যাচারিত' হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারলে সামাজিক কৌলীন্য, শ্রদ্ধা এবং অন্তর্ভুক্তি সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

সামাজিক ন্যায়ের দাবিপূরণে এমন এক অনন্ত প্রক্রিয়ার জন্ম হয়েছে যা একইসঙ্গে ব্যয়বহুল এবং গুরুত্বপূর্ণ। কারা সত্যি কথা বলছে জানা নেই কিন্তু কেউ নিজেকে 'গরিব', 'অবদমিত' কিংবা 'অত্যাচারিত' বলে দাবি করলে তার কথা উপেক্ষা করার উপায় রাষ্ট্রব্যবস্থায় থাকে না। এর ফলে একটি দেশের সামগ্রিক অর্থব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে এবং অর্থনীতিতে সংকট দেখা দেয়। নব্য মার্ক্সবাদীরাও 'পুঁজিবাদের' বাপ-বাপান্ত করতে থাকেন। বস্তুত এই ব্যবস্থা চক্রাকারে আবর্তিত হয়। কার্যত একটি দেশের অর্থব্যবস্থাকে মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য করে। তারপর যখন দেশটি আকণ্ঠ ঋণে ডুবে যায় তখন দেউলিয়া হতে তার বিশেষ সময় লাগে না।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও একই ছবি। মিডিয়ার সঙ্গে দেশের আইনসভার সদস্যদের সারাক্ষণ যুদ্ধ চলে। ইস্যুরও শেষ নেই। ওষুধপত্র নিয়ে যুদ্ধ, লোকের রক্তচাপ কেন দিন-দিন বাড়ছে তাই নিয়ে যুদ্ধ, এমনকী লোকে কেন মোটা হয়ে যাচ্ছে তাই নিয়েও যুদ্ধ করে মিডিয়া। এর সঙ্গে রয়েছে বর্ণবিদ্বেষ এবং জাতিদাঙ্গার মতো বিষয়গুলি। এই আন্দোলনের লক্ষ্য সাংস্কৃতিক শুদ্ধিকরণ অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদী মত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। সাধারণ নিরপেক্ষ মানুষ এদের বিরক্তিকর ব্যবহার সহ্য করে, বিশেষ করে শিল্প ও সাহিত্যক্ষেত্রে। কুকথার স্রোত বয়ে যায়। এসব নিয়ে গণবিতর্কের জায়গাটি যেহেতু এখন ক্ষীয়মান তাই মানুষের মৌলিক চিন্তাভাবনায় নানারকম স্ববিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে একধরনের ভণ্ডামিসর্বস্ব নৈতিকতাকে ক্রমাগত মান্যতা দিয়ে নব্য মার্ক্সবাদীরা সমাজকে এক চরম অস্তিত্ব সংকটের দিকে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। আগেই বলেছি, 'সর্বহারার একনায়কত্ব' প্রতিষ্ঠা করা এখন আর এদের লক্ষ্য নয়। এখন তাদের লক্ষ্য 'সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বিচারে শুদ্ধ' একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যে ব্যবস্থায় সর্বময় ক্ষমতা ভোগ করবে সাংস্কৃতিক মার্ক্সবাদীরা। তারাই হবেন এই রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মৌলবাদের অভিভাবক। যার জন্য তারা এখন থেকেই বিশ্বব্যাপী নানা প্রতিষ্ঠানের দখল নিতে শুরু করেছে। ব্যক্তির নৈতিক অধঃপতন এই প্রক্রিয়ায় সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নব্য মার্ক্সবাদীদের ধারণা মানুষের ভাবজগতের অবক্ষয় যত বাড়বে ততই ফুলেফলে বিকশিত হবে বিপ্লবের সম্ভাবনা।

বুদ্ধিজীবীরা নব্য মার্ক্সবাদের মেরুদণ্ডস্বরূপ। শ্রমিকরা দেশের অর্থনীতি এবং উৎপাদন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলেও তারা জানেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কোনও সারবত্তা নেই। পৃথিবীর কোথাও শ্রমিক আন্দোলনের সূত্র ধরে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়নি। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা শ্রমিকশ্রেণীর কল্যাণের কথা কখনও ভাবেনওনি, উল্টে শ্রমিকশ্রেণী বারবার সমাজতন্ত্রের শিকার হয়েছে। বিপ্লবের নেতারা হয় পার্টির মদতপুষ্ট বুদ্ধিজীবী, নয় তো সামরিক ব্যক্তি। বিপ্লবের জন্মলগ্ন থেকে লেখক-শিল্পীরা তাদের বইপত্র, সিনেমা, চিত্রকলা, সঙ্গীত ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের কঠোর ও নিষ্ঠুর চরিত্র লক্ষণগুলি ঢাকা দিয়ে রেখে বৈজ্ঞানিক, বৌদ্ধিক নান্দনিক দিক থেকে মহান দেখিয়ে জনসমক্ষে পরিবেশন করেছে। তাই মার্ক্সবাদের এই নতুন ব্যাখ্যায় সর্বহারা শ্রেণী ব্রাত্য, বুদ্ধিজীবীরা স্বাগত।

সাংস্কৃতিক মার্ক্সবাদীরা বিশ্বাস করেন একদিন বিশ্বের সব ক্ষমতা তাদের করায়ত্ত হবে এবং তারা মানুষকে শেখাবেন কী ভাবতে হবে এবং কীভাবে বেঁচে থাকতে হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই নব্য মার্ক্সবাদীরা তাদের ভবিষ্যত দেখতে পান না। তারা সম্ভবত জানেন না, যদি সত্যিই কোনদিন বুদ্ধিজীবীদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে তাদের অবস্থা হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণীর মতো। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীরাই বিপ্লবের বলি হবেন। ঠিক এরকমই ঘটেছিল ফরাসি বিপ্লবেও। ফরাসি বিপ্লব ছিল লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের প্রথম বিপ্লব প্রয়াস। গিলোটিনে যারা মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিপ্লবের সমর্থক।

জর্জ বুকনার তার বিখ্যাত নাটক 'ডেনটনস ডেথ'-এর এক চরিত্রকে দিয়ে বলিয়েছিলেন, 'শয়তানের মতো বিপ্লবও তার নিজের সন্তানদের গিলে ফেলে।' অর্থাৎ বিপ্লব সফল হলে সে তার জন্মদাতাদেরই আগে হত্যা করে। আজ যারা সাংস্কৃতিক মার্কসবাদের জন্ম দিয়ে চলেছেন, যেদিন তাদের মতাদর্শ স্বীকৃত হবে (আদৌ যদি হয়!) সেদিন তাদেরই রক্ত চাইবে সেই নতুন পৃথিবী। নয়তো তার অভিষেক হবে না।

বুদ্ধিজীবীদের একটা বড়ো অংশ এখনও বিপদটা বোঝেননি। সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী অনেক দাম দিয়ে একটা কথা বুঝেছেন, একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমাজতন্ত্র মানুষকে কেবল নির্বিচারে ব্যবহার করে। ব্যবহার করে ছুড়ে ফেলে দেয়। বুদ্ধিজীবীদেরও সেই একই ভবিতব্য অপেক্ষা করছে।

(লেখক অর্থনীতির অধ্যাপক।
বর্তমানে ব্রাজিলে কর্মরত)
সৌজন্যে : অর্গানাইজার

যোগীজীর কথায় বীর হনুমানের অপমান খুঁজে পেলেন যাঁরা হিন্দুবিদ্বেষী রাজনীতি করছেন

প্রীতীশ তালুকদার

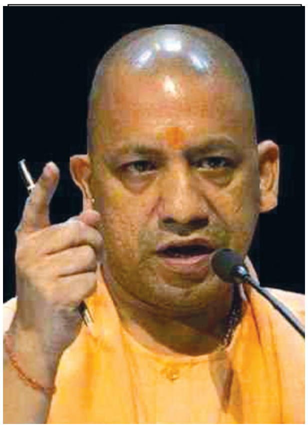

মহাবীর হনুমানকে নিয়ে দু'কথা লেখার খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সৌজন্যে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বক্তব্য এবং তা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার মাতামাতি। যোগীজী মহাবীর হনুমানের অপমান করেছেন বলে চেল্লা হল্লা শুরু করেছে একটি শ্রেণী। কী অপমান করেছে? যোগীজী মহাবীর হনুমানকে বনবাসী দলিত, নির্যাতিত বলেছেন। বনবাসী, দলিত, নির্যাতিত শব্দগুলো কী অপমানসূচক, হীন! কী বোঝাতে চাইছেন এই সমালোচক কংগ্রেসি, বামপন্থী, মুলায়ামপন্থী ও মায়াবতীপন্থীরা—'বনবাসী', 'দলিত', 'নির্যাতিত'রা সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য নন! হিন্দুর কোনও আরাধ্যের পরিচয় কি খুব অবমাননাকর? শ্রীরাম ও রামমন্দিরের চরম শত্রুরা হঠাৎ রামভক্ত হয়ে উঠেছেন শ্রীরাম বা মহাবীর হনুমান-ভক্তিতে নয়, দিল্লির সিংহাসনের লালসায়। যাঁরা রাম ও হনুমানের ইতিহাস-কাহিনিতে অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন তাঁরা হঠাৎ রাজনীতির ফসল তুলতে ভক্ত সাজলে এমনটা হবার কথা বটে! কে এই মহাবীর বজরঙ্গবলী হনুমান?

কাহিনি অনুসারে সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠলে সেই অমৃত থেকে অসুরদের দূরে রাখতে ভগবান বিষ্ণু সুন্দরী নারীরূপ ধরেন, আর তাতেই মোহিত হয়ে পরেন দেবাদিদেব মহাদেব। সেই হর ও নারীরূপ হরির মিলনে উৎপন্ন হয় ভ্রূণ। কিন্তু বিষ্ণু তো নারী নন, তিনি স্বরূপে ফিরে আসেন, তাই সে ভ্রূণ রক্ষিত হতে থাকে পবনদেবের দায়িত্বে। সেই ভ্রূণই পবনদেব প্রতিস্থাপন করেন বানরী অঞ্জনার গর্ভে এবং তাতেই মহাবীর হনুমানের জন্ম। মানুষ যখন নিজ কর্মগুণে মহৎ হয়ে ওঠেন, দেবতার আসন অলঙ্কৃত করেন, তখন এমন দেব সংযোগের কাহিনির প্রয়োজন হয়ে পরে ভক্তদের কাছে। এ কাহিনি ত্যাগ করা যেতে পারে, তাতে মহাবীর হনুমানের পরিচয় ও গৌরবের কোনো হানি ঘটে না। হনুমান তাঁর নাম, জাতি তাঁর পরিচয় নয়। সূর্যকে ধরতে গিয়ে হোক বা বালসুলভ চপলতার কারণে হনু বা থুতনির হাড় ভেঙে যাবার কারণে তাঁর নাম হয় হনুমান। তবে যে পিতা-মাতার ঘরে, যে সমাজে তাঁর জন্ম তাঁদের বানর জাতিই বলা হয়েছে। তারা বনমধ্যে কিস্কিন্ধ্যা পর্বতের গুহায় বাস করতেন। বানরেরা বনে, পর্বতের গুহায় বাস করবে তাতে আর আশ্চর্য কী, সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু মহাবীর হনুমান কী প্রকৃতই গেছো বানর বা লম্বা লেজওয়ালা চারপেয়ে হনুমান?

এই হনুমানজী সম্পর্কে ঋষি অগস্ত বলছেন, তিনি পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি,প্রতাপ, সুশীলতা, গাম্ভীর্য, চতুরতা প্রভৃতি নানা গুণে গুণান্বিত। শাস্ত্রজ্ঞানাকাঙ্ক্ষায় তিনি বহু ভ্রমণ করেছেন। পাণ্ডিত্যে ও বেদার্থ গ্রহণে তাঁর সমকক্ষ কেউ নাই। তিনি সর্বশাস্ত্র বিশারদ। আবার ঋষ্যমুক পর্বতে সুগ্রীব দূত হনুমানের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর শ্রীরামচন্দ্র তাঁর বিষয়ে লক্ষ্মণকে বলছেন, 'এঁর স্বল্প অথচ সুনিপুণ বাক্য শুনে বোঝাই যাচ্ছে ইনি বিচক্ষণ ও বিদ্বান। এঁর ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ সুনির্বাচিত ও মধুর।' এই সব জ্ঞান গুণ আমাদের পছন্দ নয়, আমাদের ভালো লাগে অদ্ভুত বীরত্বসম্পন্ন অতিরূপ হনুমান। তাই হনুমানের কথায় তাঁর জ্ঞান ও গুণের কথা আমাদের মনেই আসে না।

আধুনিক যুগেও যেমন নগরভিত্তিক সভ্যতার বাইরে বনে-জঙ্গলে বনবাসী জনজাতি সমাজ আছে, তেমনটা দু-হাজার, পাঁচ হাজার, দশ হাজার বছর আগেও ছিল। বীর হনুমান বানর প্রজাতির নয়, শাস্ত্রজ্ঞানী সংযমী এবং মানুষের ভাষায় কথা যখন বলে তখন তিনি মানুষই। মানুষ হলেও নগরভিত্তিক সভ্যতায় তাঁর বসবাস নয়, তাঁর সমাজ ও বসবাস বনে, গিরিগুহায়। সেভাবে বনবাসী-গিরিবাসী জনজাতিরাই বসবাস করে। বর্তমান সময়ে 'নাগ' পদবি দেখে কাউকে সাপ বলে মনে না হলেও রামায়ণ-মহাভারত বা পুরাণের ঘটনায় নাগজাতি বা নাগবংশের কথা শুনলেই সাপ বলে আমাদের মনে ভ্রম হয়। মহাভারতের অর্জুনপত্নী উলুপী যেমন নাগকন্যা হলেও নাগিনী নন, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পত্নী নাগকন্যা কুবেরি নাগ যেমন সাপ নয়, তেমন বীর হনুমানও গেছো হনুমান নন। শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন জনজাতি আজও বিভিন্ন পশু বা পাখিকে নিজেদের সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মানে, পূজা করে, উৎসব অনুষ্ঠানে সেই পশু বা পাখির রূপে সাজে। হনুমান যে বানবাসী জনজাতির সে জনজাতিতে হনুমান বা বানরের সে স্থান হয়ে থাকতে পারে যা থেকে তারা নিজেদের বানর পূজক জাতি বা বানরজাতি রূপে পরিচয় দিত।

শ্রীযোগীজীর বক্তব্যটা ঠিক কী ছিল এবার দেখা যাক। বজরঙ্গবলী লোকনেতা, যিনি বনবাসী গিরিবাসী দলিত বঞ্চিত মানুষদের পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণের সকল মানুষকে একসঙ্গে জুড়েছেন। তাঁর অপমানটা কোথায়? হ্যাঁ, বনবাসী জনজাতির কেশরী ও আঞ্জনার পুত্র মহাবীর হনুমান-ই সেই ব্যক্তি যিনি প্রথম নগরভিত্তিক সমাজের মানুষের সঙ্গে বনবাসী-গিরিবাসী জনজাতি মানুষদের প্রথম অটুট বন্ধনে বেঁধেছেন। হনুমানই প্রথম জনজাতি ব্যক্তি যিনি নগর সভ্যতার মানুষের হৃদয়ে ভগবানের স্থান লাভ করে পরম শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, শ্রীরামের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িয়ে আছেন, পূজিত হচ্ছেন ভগবান রূপে। মজার কথা হলো, কোনো হিন্দু ধর্মনেতা বা সাধুসন্ত বা যাঁরা সনাতন হিন্দুধর্ম ও হিন্দুর দেব-দেবীর জন্য প্রতিনিয়ত শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছেন তাঁরা কেউ যোগীজীর কথায় মহাবীর হনুমানের অপমান দেখতে পেলেন না। শ্রীরামভক্ত হনুমানজীর অপমান দেখল তাঁরাই যারা হিন্দুত্বে সাম্প্রদায়িকতা দেখছেন, হিন্দুবিদ্বেষী রাজনীতি করছেন। অথবা রামমন্দিরের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হালদার মশায় হলে বলতেন : ভেরি ভেরি সাস্পিসিয়াস! ▌

নবাঙ্কুর

হিরের দাম

এক বুদ্ধিমান জহুরি ছিলেন। তিনি নিজের কাজে খুব দক্ষ ছিলেন। যুবক বয়সেই স্ত্রী ও এক পুত্র রেখে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়স্বজন তাঁর স্ত্রীকে ঠকিয়ে ধনসম্পদ আত্মসাৎ করে নেয়। মৃত্যুকালে জহুরি একটি দামি হিরে স্ত্রীকে দিয়ে যান। জহুরির পুত্র যখন যুবক হলো তখন তার মা ছেলেকে বলল যে, এটি তোমার বাবা রেখে গেছেন। এর দাম কিছুই বলেননি। শুধু বলেছিলেন এটি অমূল্য। কেউ যদি এর দাম নির্ধারণ করে তাতে তার শুধু বুদ্ধির দাম নির্ধারিত হবে, হিরের দাম নয়। তুমি শুধু হিরেটির দাম জেনে এস। বিক্রি করে আসবে না।

ছেলেটি হিরে নিয়ে বাজারে গেল। প্রথমে এক সবজি বিক্রেতাকে তার দাম জিজ্ঞাসা করল। সবজি বিক্রেতা বলল, আরে এই বাচ্চাদের খেলার জিনিসটি খুব সুন্দর। তুমি এর বদলে দুটো মুলো নিয়ে যাও। আরও এগিয়ে সে আরও কয়েকজনকে দাম জিজ্ঞাসা করাতে কেউ পাঁচ টাকা, কেউ দশ টাকা বলল। তারপর সে এক স্বর্ণকারের কাছে গেলে দাম পঞ্চাশ টাকা উঠল। তারপরে সে এক জহুরির কাছে গেল। জহুরি পাঁচশো থেকে হাজার টাকা দিতে চাইল। একজন হিরে ব্যবসায়ী এক লক্ষ টাকা বললেন। ছেলেটি বড়ো আশ্চর্য হলো হিরের দামের এই বৈচিত্র্য দেখে।

লোকের কাছে জিজ্ঞেস করতে করতে ছেলেটি একজন বৃদ্ধ জহুরির কাছে পৌঁছল। সেই বৃদ্ধ অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং খাঁটি জহুরি ছিলেন। তিনি হিরেটি দেখেই বললেন, এই হিরে তুমি কোথায় পেলে? ছেলেটি বাবার নাম করে তাঁর বাবার রেখে যাওয়ার কথা বলল। বৃদ্ধ জহুরি নাম শুনেই বুঝতে পারেন তার বাবা একজন নামকরা জহুরি ছিলেন। ছেলেটি বলল আমি তাঁরই ছেলে। হিরেটির দাম কত দেবেন? বৃদ্ধ জহুরি বললেন, এর কোনো দাম হয় না। এটি অমূল্য হিরে। আমার কাছে যত সম্পদ আছে তা সব দিলেও এর পুরো দাম হবে না। আর এর দাম নির্ধারণ করলে হিরেটির অপমান করা হবে। তবে হ্যাঁ তুমি যা চাও, আমি তোমাকে তা দেব।

বৃদ্ধ জহুরি বললেন, আমার তিনটে দোকান আছে। প্রথম দোকানে আমি তোমাকে পনেরো মিনিট সময় দেব। দ্বিতীয় দোকানে পঁচিশ মিনিট এবং তৃতীয় দোকানে এক ঘণ্টা সময় পাবে। এই সময়ের মধ্যে তুমি দোকান থেকে যা কিছু নিতে পারবে , তা সব তোমার হয়ে যাবে। সময় পার হয়ে গেলে তুমি আর কিছুই নিতে পারবে না

ছেলেটিকে প্রথম দোকানে নিয়ে যাওয়া হলো। লক্ষ লক্ষ টাকার হিরে তাতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কয়েকটি বাক্সেও রয়েছে, তাতে হিরে চমক দিচ্ছে। এসব দেখে তার মাথা ঘুরে গেল। সে শুধু দেখতেই থাকল। সঙ্গের লোকটি বলল সময় শেষ, বাইরে চল। দ্বিতীয় দোকানে নিয়ে যাওয়া হলো। দোকানটি আগের থেকেও বেশি সাজানো। সে শুধু দেখতেই থাকলো। এভাবে সময় শেষ হয়ে গেল। তৃতীয় দোকানে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো। সে ভাবল এখানে তো এক ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে, একটু দেখেই ব্যাগ ভর্তি করে নেবে। দোকানটি বেশ বড়ো। খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, মোটর সাইকেল, গাড়ি ইত্যাদি নানা জিনিসে ভরা। তাছাড়া মনোরঞ্জনেরও নানা ব্যবস্থা ছিল। এসব দেখতে দেখতেই তার সময় শেষ হয়ে গেল। সঙ্গের লোকটি তাড়া দিতে শুরু করল। সে দোকান থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরনোর সময় হাতের কাছে একটি ব্যাগ পেয়ে সেটিই নিল। বাইরে এসে থলিটা খুলে তে দেখে তাতে অচল সিকি, লোহার টুকরো, পাথর ইত্যাদি অকেজো জিনিসে ভরা।

বৃদ্ধ জহুরি তাঁর লোককে বলে রেখেছিলেন, ছেলেটি যা নেবে তা যেন তাঁকে জানানো হয়। সব শুনে তিনি বললেন, ও যেন আমাকে আর মুখ না দেখায়। ও কোনো কাজের নয়। বেচারি খালি হাতে ফিরে গেল। তিনি তাঁর দোকানের লোকদের বললেন, এভাবেই নানা চক্রে চালিত হয়ে মানুষ অমূল্য সময় ও জীবন বৃথা নষ্ট করে ফেলে।

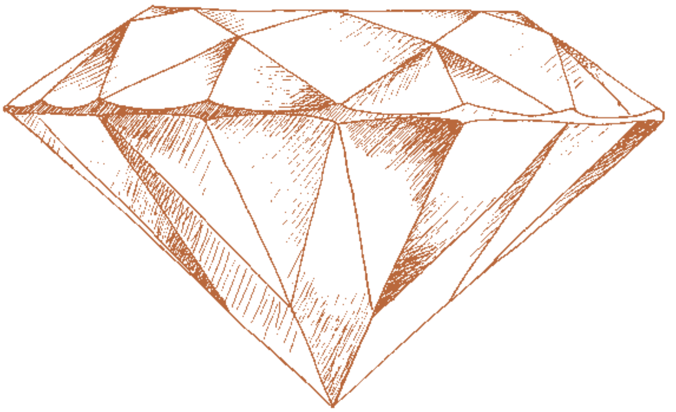

(সংগৃহীত)

ভারতের পথে পথে

শৃঙ্গেরী

সপ্তম শতকের জগৎগুরু আদি শঙ্করাচার্যের গড়া চারটি মঠের প্রথমটি পশ্চিমঘাট পর্বতে তুঙ্গনদীর পাড়ে শৃঙ্গেরীতে। এই মঠের জন্যই শৃঙ্গেরীর সমৃদ্ধি। এখান থেকে কিছুদূর গিয়ে তুঙ্গনদী মিশেছে ভদ্রানদীতে। নাম হয়েছে তুঙ্গভদ্রা। মঠে বিদ্যার দেবী সারদা বা সরস্বতী আরাধ্যা। সারদা দেবীর মন্দিরটি আদি শঙ্করাচার্যের সময়ে তৈরি। চতুর্দশ শতকে নির্মিত বিজয়নগর রাজাদের তৈরি বিদ্যাশঙ্কর মন্দিরে রাশিচক্রের বারোটি স্তম্ভে সূর্যালোক এসে পড়ে। রয়েছে কারুকার্যময় আশি বছর আগের অসম্পূর্ণ চেন্নাকেশব মন্দির। মন্দিরের বাইরের দেয়ালও কারুকার্যময়। আলাদা পরিসরে মঠের অধীনে একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় মন্দিরে ছাত্রদের বেদমন্ত্রপাঠ এক পবিত্র পরিবেশ নির্মাণ করেছে।

জানো কি?

- রামায়ণ ও মহাভারতকে মহাকাব্য বলা হয়।
- রামায়ণে ৭টি কাণ্ড ও মহাভারতে ১৮টি পর্ব রয়েছে।
- রামায়ণ রচনা করেন বাল্মীকি মুনি।
- মহাভারত রচনা করেন বেদব্যাস।
- শ্রীগীতা মহাভারতেরই অংশ।
- বাংলায় মহাভারত লেখেন কাশীরাম দাস।
- বাংলায় রামায়ণ লেখেন কৃত্তিবাস ওঝা।

ভালো কথা

বিপদে বুদ্ধি

স্কুলে যাওয়ার সময় আমার বাবা প্রতিদিন আমাকে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় অবধি এগিয়ে দিয়ে স্বস্তিকা আফিসে চলে যায়। সেখান থেকে বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলে যাই। সেদিনও বাবা পাঁচমাথার মোড়ে ছেড়ে দিয়ে স্বস্তিকায় চলে যায়। আমি বন্ধুদের সঙ্গে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা বাস একটা ভ্যানরিকশাকে ধাক্কা দিতেই ভ্যানওয়ালা ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। আমরা দৌড়ে কাছে গেলাম। কী করবো ভেবে উঠতে পারছিলাম না। তারপরই আমি দৌড়ে গিয়ে থানায় খবর দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে ভ্যানওয়ালাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। আমরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আমার বন্ধুরা বলল, থানায় খবর দেওয়ার ভাবনাটা তোর মাথায় কীকরে এল?

বললাম, বাবা আমাকে বলেছে কোথাও কেউ বিপদে পড়লে থানায় খবর দিতে কিংবা ফোন করতে হয়।

স্রোতস্বিনী কাহার, নবমশ্রেণী,খান্না, কলকাতা-৪।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

বল্লীর বিল

জয়জিৎ মণ্ডল, নবম শ্রেণী, বসিরহাট।

নবাতকাটির বল্লীর বিল
বাংলাদেশের পাশে
শান্ত শীতল বিলের জলে
ডিঙি ডোঙা ভাসে।
মৃদু হাওয়ায় নাল-পদ্ম
দোলে ধীরে ধীরে
পানকৌড়িরা স্বচ্ছ জলে
ডুব দিয়ে মাছ ধরে।

ডিঙি নিয়ে আসে জেলে
ডোঙা নিয়ে চাষি
মাছ-শাকটা পেলে ওরা
হয় যে বেজায় খুশী।
বিলের শোভা অপূর্ব হয়
শীতের সকালবেলা
প্রকৃতিদেবী বসায় তখন
পাখপাখালির মেলা।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।।৩।।

মস্কো থেকে ভুবনেশ্বর, ঔজ্জ্বল্যে পরিপূর্ণ বেলজিয়াম

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বছরটা ছিল বেলজিয়ামের। ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাজধানী বেলজিয়াম দেশটা এযাবৎ বিখ্যাত ছিল টিনটিনের স্রষ্টা হার্জ ও হলিউডের চিরস্মরণীয় অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বোর দেশ হিসেবে। এখন থেকে বিশ্ব ছবির মতো সুন্দর দেশটিকে স্মরণ করবে ফুটবল ও হকির নান্দনিক ও ছন্দমাত্রিক খেলিয়ে দেশ হিসেবে। টিনাটিনের স্রষ্টা উইলিয়াম হার্জ যেমন দু'হাতে ছবি আঁকা ও কমিক স্ট্রিপ লিখতে পারতেন তেমনি বেলজিয়ামের ফুটবল ও হকি খেলোয়াড়রা যথাক্রমে দু-পা, মাথা এবং স্টিকের দুদিক ব্যবহার করে নিজেদের অন্য মাত্রায় তুলে নিয়ে গেছেন। ভাগ্য একটু সুপ্রসন্ন থাকলে বেলজিয়াম এবছর ফিফা সকার বিশ্বকাপও মস্কোর মোই থেকে নিয়ে আসতে পারত। চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের মুখোমুখি হয় বেলজিয়াম সেমিফাইনালে। কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়ামে ভয়ংকর সুন্দর ব্রাজিলের বিরুদ্ধে অসাধারণ ম্যাচ খেলে শেষ পর্যন্ত জিতলেও খেলোয়াড়দের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। যার দরুন ফ্রান্সের সঙ্গে সমানতালে লড়েও ক্লান্তির কারণে মাঠে ম্যাচ ছেড়ে দিয়ে আসতে বাধ্য হয়। ফাইনালে না উঠতে পারলেও ইডেন হ্যাজাউ, লুকাকু, দ্য ব্রইন, ফেলাইনিদের শিল্প-সুষমামণ্ডিত বল-প্লে গোটা দুনিয়াকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছিল। ফিফার অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন, মস্কোয় বিশ্বের হৃদয় জিতে যথার্থ চ্যাম্পিয়ন বেলজিয়াম।

ভুবনেশ্বরে কিন্তু বেলজিয়ম বিশ্বকাপ হকির আসরে হৃদয় মনন দু-ক্ষেত্রেই দুনিয়াদারি দেখিয়েছে। টুর্নামেন্ট শুরুর থেকে ফাইনাল পর্যন্ত দারুণ খেলে জমি ধরিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান, জার্মানি, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডের মতো পাওয়ারকে। একমাত্র ভারতীয়রা গ্রুপের খেলায় রীতিমতো বেগ দিয়েছে বেলজিয়ামকে। ভারত ম্যাচ চূড়ান্ত কঠিন অবস্থায় উতরে দিয়ে যেন বাড়তি অক্সিজেন পেয়ে যায় বেলজিয়াম। এরপর চারটি বড়ো দেশ বেলজিয়ামের টোটাল হকির সামনে খেই খুঁজে পায়নি। সেমিফাইনাল ম্যাচটি বেলজিয়াম পুরো ৫০ মিনিট একতরফা খেলে ইংল্যান্ডকে ৬-০ গোলে হারায়। এ ধরনের রেজাল্ট বিশ্বপর্যায়ের টুর্নামেন্টে শেষ চারে ঘটা স্বপ্নেও কল্পনা করা সম্ভব নয়। অন্য সেমিফাইনালে নেদারল্যান্ড (তিনবারের বিজেতা) বিশ্ব হকির অজেয় শক্তি অস্ট্রেলিয়াকে পেনাল্টি শুট আউটে হারিয়ে রীতিমতো আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে মাঠে নামে ফাইনালে বেলজিয়মের সঙ্গে।

বহুদিন পর বিশ্বকাপ হকির ফাইনালে দেখা গেল তুল্যমূল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইদানীংকালে বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক সর্বোচ্চ পর্যায়ের টুর্নামেন্টে অস্ট্রেলিয়া বিপক্ষকে নিয়ে ছেলেখেলা করে ট্রফি জিতে নিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাকি বিশ্ব একজোট হয়ে খেললেও বোধহয় হেরে যাবে এমনটাই সর্বজনীন ধারণা। এবার অজিদের ফাইনালে উঠতে না পারাটা বছরের সেরা বিস্ময়। তবে অস্ট্রেলিয়া না থাকলেও বিশ্বকাপ ফাইনাল কিন্তু মাঠের দর্শকদের সঙ্গে টিভির পর্দায় চোখ রাখা ১০০টি দেশের প্রায় ২০০ কোটি মানুষের হৃদয় মন্থন করিয়েছে বিশ্ব হকির সেরা সময়ের বিভিন্ন মুহূর্তের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। নেদারল্যান্ড বেলজিয়াম ফাইনালটি তাই সব অর্থেই মহাকাব্যিক। কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর প্যাটার্নউইভিং হকি খেলে বেলজিয়াম শক্তিশালী ডাচ ডিফেন্সকে কখনও স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি।

নির্ধারিত সময়ে খেলা অমীমাংসিত থাকার ফলে পেনাল্টি শুট আউটের মাধ্যমে খেলার ফয়সালা হয়। ধৈর্য্য, মনোসংযোগ, বৈচিত্র্য এবং সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম টাচ দেখিয়ে বেলজিয়াম শেষপর্যন্ত নেদারল্যান্ডকে হতোদ্যম করে দেয়। বেলজিয়ামের সাইমন গাউজাউ সেমিফাইনালের আগে পিতার মৃত্যু সংবাদ পান। কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্টের কথা না শুনে দেশের হয়ে খেলাকেই অগ্রাধিকার দেন।

ভিকট্রি পেডিয়ামে তাঁর গলায় যখন সোনার পদক পরানো হচ্ছে তা দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি বেলজিয়ামবাসী। জন ডোমেন বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন। গত কয়েকবছর ধরেই তিনি সেরা অলরাউন্ড খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃত। বিশ্বকাপ জিতে তার ও বেলজিয়ামের যথার্থ মূল্যায়ন হলো। সকার ও হকিতে বেলজিয়াম ইদানীংকালে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বিশ্ববৃত্তে উঠে আসা টিম। প্রথমবার তাদের বিশ্বকাপ হকি জেতাটা তাই সঙ্গত। ▮

অন্য রকম

বাবার স্মৃতিরক্ষায় এনআরআই পুত্রের রাস্তা সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় সমাজে পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরিবার হলো সেই জায়গা যেখানে একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। বড়ো হয়ে সে কেমন হবে— ভালো না খারাপ, সেটা ঠিক করে দেয় তার পারিবারিক মূল্যবোধ। মূল্যবোধের কথা যখন উঠল তখন সেইসব মূল্যবোধের আধার পারিবারিক সম্পর্কগুলোর কথাও বলতে হয়। বিশেষ করে বাবা-মা'র সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক। বস্তুত বাবার স্নেহ আর মায়ের মমতা বাদ দিয়ে কোনও কিছুই সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। একথা আরও ভালো বোঝা যাবে ডিব্রুগড়ের গৌতম বরদলৈয়ের জীবনের দিকে তাকালে। গৌতম বরদলৈ ডিব্রুগড়ের একমাত্র আন্তর্জাতিক মানের রাস্তাঘাটের নির্মাতা। রাস্তার নাম গৌতমের বাবার নামে— 'হেরম্ব বরদলৈ পথ'। এ রাস্তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় হকচকিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এমনকী একথাও মনে হতে পারে যে, এই শহরটার নাম ডিব্রুগড় নয়, সিঙ্গাপুর। ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা এ রাস্তার সম্পদ। সঙ্গে আরও অনেক কিছুর মধ্যে প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো সৌরবিদ্যুৎ চালিত আলোকসজ্জা এবং রাস্তার দু'পাশে পর্যাপ্ত গাছগাছালি।

অথচ কয়েক বছর আগেও এই রাস্তা ছিল কাঁচা। বর্ষাকালে এত জল জমত যে, যাতায়াত করে কার সাধ্য। স্থানীয় বৈরাগীমঠ এলাকার মানুষজনের সেই জলে ডোবা কাঁচা রাস্তাটির কথা মনে পড়লে এখনো শিউড়ে ওঠেন। পঞ্চাশ বছরের প্রতিমা দাস স্মৃতিরোমন্থন করে জানালেন, 'বর্ষাকালে রাস্তার দশা হতো ছোটোখাটো খালের মতো। জন্তুজানোয়ারও দেখলে আঁতকে উঠবে। আর এখন.... আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না।' বৈরাগীমঠ এলাকায় প্রায় সহস্রাধিক পরিবারের বাস এবং এই রাস্তাই এখানকার প্রধান রাস্তা।

কিন্তু কীভাবে হলো এই পরিবর্তন? গৌতমের বাবা হেরম্ব বরদলৈ ছিলেন এখানকার সর্বজনমান্য সমাজসেবী। ২০০৮ সালে তিনি মারা যান আর সে বছরই রাস্তার নামকরণ হয় তাঁর নামে। গৌতম বলেন, '২০০৮ সালে ডিব্রগড় মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তার নামকরণ করল বাবার নামে। কিন্তু তখন রাস্তার হাল ছিল খুবই খারাপ। তাই হংকং প্রবাসী প্রযুক্তিবিদ পুত্র বাবার স্মৃতিরক্ষায় নেমে পড়লেন পরিবর্তনের যুদ্ধে।' বাবার স্মতিচারণা করে গৌতম বলেন, 'আমার বাবা আদতে সাংবাদিক হলেও সারা জীবন ব্যয় করেছেন সমাজসেবার কাজে। ১৯৬৮ সালের বন্যায় মোহনপুরে আটকে পড়া ধীবর সম্প্রদায়ের অনেক মানুষকে বাবা প্রায় একার চেষ্টায় নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যান। সেখানে তাদের গ্রাম গড়ে ওঠে। সে গ্রামের নাম নতুন টেকেলা সিরিং মোটেক গ্রাম। বাবা ওদের জমির কাগজপত্র তৈরি করতে সাহায্য করেন। বাবার চেষ্টায় গ্রামে লাইব্রেরি এবং একটি নামঘর(প্রার্থনাকক্ষ) তৈরি হয়। প্রত্যেক বছর বিহুর সময় ওরা এখনও আমার মাকে নিমন্ত্রণ করে।'

২০১৩ সালে গৌতম রাস্তা করা শুরু করেন। সেই সময় তাঁকে নিয়মিত হংকং থেকে যাতায়াত করতে হতো। তিনি প্রথমে স্থানীয় যুবকদের নিয়ে একটা টিম তৈরি করে নেন। তারপর হাত দেন রাস্তা উঁচু করার কাজে। প্রায় দেড়ফুট উঁচু করা হয় রাস্তাটি। ২০১৭ সালে শুরু হলো আসল কাজ। গৌতম বলেন,' আমি আগে ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি করি। এই একটা জিনিস না থাকার ফলে বর্ষাকালে জল জমত। এরপর শুরু হলো রাস্তার দু'ধারে বাগান তৈরির কাজ। আমি স্বীকার করি, স্থানীয় মানুষজনের সাহায্য না পেলে এ কাজ কিছুতেই করা যেত না। বিশেষ করেল্পবয়সি ছেলে-মেয়েদের কথা। ওদের উৎসাহ আর পরিশ্রম আমি কোনওদিন ভুলব না।'

রাস্তার সাজসজ্জা, বিশেষ করে দু'ধারে বাগান সত্যিই চোখে পড়ার মতো। বাগানে নানারকমের ফুল ও ফলের গাছের পাশাপাশি রয়েছে হলুদ, ধনে এবং পেঁপে গাছও। ১৭৮ মিটার রাস্তার এপ্রান্ত থকে ওপ্রান্ত যেতে যেতে গাছগাছালির বর্ণময় আয়োজনে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু শুধু কি গাছ? না, পথনিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গৌতম ভোলেননি। তাঁর তৈরি রাস্তায় রয়েছে পেভমেন্ট মার্কার, স্পিড ব্রেকার এবং পথনিরাপত্তা সংক্রান্ত নানা নির্দেশ সংবলিত ভিনাইল বোর্ড।

এরপরও একটা কূট প্রশ্নের উত্তর বাকি থেকে যায়। সেটি বরং আমরা গৌতমের মুখ থেকেই শুনিঃ 'এই রাস্তা তৈরি করতে আমার পাঁচ বছর সময় লেগেছে। এখন অনেকেই জানতে চান, মোট কত টাকা খরচ হলো? কিংবা এই এলাকায় সবাই কি আপনাকে সাহায্য করেছে? উত্তরে আমি যখন বলি, হ্যাঁ সাহায্য অনেকেই করেছেন। তবে খরচ আমি একাই করেছি। কিন্তু কত টাকা খরচ হয়েছে তা আমি বলব না। বাবাকে আম কিছু উপহার দিতে চেয়েছিলাম। তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। সেইটুকু করতে পেরেছি, আর আমার কিছু চাই না।' ∎

বিশেষ নিবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের দ্রুত পরিবর্তিত জনবিন্যাস

মুক্তি কোন পথে?

নীল ব্যানার্জি

মুসলিম লিগের দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভাজিত হয়। এই দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুযায়ী মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় পৃথক এক জাতি, সুতরাং তাদের পৃথক দেশ চাই। সেই অনুযায়ী পাকিস্তান হয়। পরবর্তীকালে ভারতীয় সেনার বদান্যতায় পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী মুসলমানরা ১৯৭১-এ নতুন দেশ বাংলাদেশ পায়। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দুটিই ইসলামিক দেশ। অন্যদিকে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৬-এ জরুরি অবস্থা চলার সময় সংবিধানের ৪২তম সংশোধন করে প্রস্তাবনায় 'সেকুলার' বা ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি ঢুকিয়ে দেন। অর্থাৎ দুদিকে দুই ইসলামিক দেশের মাঝখানে প্রায় ২০ কোটি মুসলমান (দেশের জনসংখ্যার প্রায় ১৫ শতাংশ) নিয়ে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষ। এবার আসি পশ্চিমবঙ্গের কথায়। দেশভাগের ফলে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভারতবর্ষের দুই সমাজ— পঞ্জাবি ও বাঙ্গালি। কিন্তু পঞ্জাবে জনবিনিময় হয়েছিল। অর্থাৎ ভারতীয় পঞ্জাবে অধিকাংশ শিখ ও হিন্দু চলে আসে এবং পাকিস্তানের পঞ্জাবে অধিকাংশ মুসলমান চলে যায়। এই জন বিনিময় দ্বারা শিখ ও হিন্দুরা মিলিতভাবে পঞ্জাবে মুসলমান সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী পঞ্জাবের জনসংখ্যার ২ শতাংশেরও কম মুসলমান। কিন্তু এদিকে বাংলার ক্ষেত্রে তো বাংলা ভাগ নিয়েই অনেক টালবাহানা চলে। শেষ পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার, মেঘনাদ সাহার মতো বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাগ হয় এবং বাংলার পশ্চিমের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয়— যেখানে বাঙ্গালি হিন্দু বাড়ির মহিলাদের

পশ্চিমবঙ্গ			মুর্শিদাবাদ			মালদা		
	হিন্দু	মুসলমান		হিন্দু	মুসলমান		হিন্দু	মুসলমান
১৯৫১	৭৮.৪৫%	১৯.৮৫%	১৯৫১	৪৪.৬০%	৫৫.২৪%	১৯৫১	৬২.৯২%	৩৬.৯৭%
২০১১	৭০.৫৪%	২৭.০১%	২০১১	৩৩.২১%	৬৬.২৭%	২০১১	৪৭.৯৯%	৫১.২৭%

উত্তর দিনাজপুর			বীরভূম			দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা		
	হিন্দু	মুসলমান		হিন্দু	মুসলমান		হিন্দু	মুসলমান
১৯৫১	৬৯.৩০%	২৯.৯৪%	১৯৫১	৭২.৬০%	২৬.৮৬%	১৯৫১	৭৩.৯০%	২৫.৩৫%
২০১১	৪৯.৩১%	৪৯.৯২%	২০১১	৬২.২৯%	৩৭.০৬%	২০১১	৬৩.১৭%	৩৫.৫৭%

নিয়ে সম্মানের সঙ্গে স্বাধীনভাবে বাঁচার এবং ধর্মাচরণ করার অধিকার পায়। শুধু পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালিই নয়, পূর্ববঙ্গ থেকে ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে সম্পত্তি ও নারীর সম্মান খুইয়ে আগত হিন্দু ও তাদের বংশধর মিলিয়ে প্রায় এক কোটি মানুষের আশ্রয়স্থলও হলো এই পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু বাঙ্গালির শেষ আশ্রয়স্থল এই পশ্চিমবঙ্গও আজ হিন্দু থেকেদের চলে যেতে বসেছে। পশ্চিমবঙ্গে জনবিন্যাসের ব্যাপক রদবদল প্রকৃতপক্ষে কতটা ভয়ানক এবং তার সমাধানের উপায়গুলিই বা কী--- তা আলোচনাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম জনগণনায় ১৯৫১-তে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ১৯ শতাংশ, যা ২০১১-তে ২৭ শতাংশেরও বেশি হয়ে গেছে। বর্তমানে ২০১৮-র শেষ পর্বে তা প্রায় ৩০ শতাংশ একথা বলাই যায়। সবথেকে আশঙ্কার কারণ হলো যে, ০-৬ বছরের বয়স স্তরে মুসলমান জনসংখ্যা প্রায় ৩৭ শতাংশ। মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং উত্তর দিনাজপুর--- পশ্চিমবঙ্গের এই তিনটি জেলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু। আর বীরভূম জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা ৩৭ শতাংশের বেশি। এই চারটি জেলা ছাড়াও দুই চব্বিশ পরগনা এবং নদীয়ার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অধিকাংশ ব্লকেই মুসলমানরা সংখ্যাগুরু। প্রায় এক কোটি হিন্দু পূর্ববঙ্গ থেকে এদেশে আশার পরও মুসলমান জনসংখ্যার এই বিপুল বৃদ্ধি আশ্চর্যজনক। এর দুটি কারণ— (১) বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক বেআইনি মুসলমান অনুপ্রবেশ এবং (২) মুসলমান পরিবারগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অত্যধিক হার। সমস্যার এই কারণগুলির মধ্যেই সমস্যা সমাধানের উপায়ও খুঁজে পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সমস্যা সমাধানের উপায় দুটি :

১। পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (National Register of Citizen or NRC) প্রকাশ :

পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি মুসলমানদের তাড়ানোর জন্য নাগরিকপঞ্জি দরকার। এরা হলো 'অনুপ্রবেশকারী'। এতে হিন্দু 'শরণার্থী'দের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬-তে যে 'Citizenship Amendment Bill' এনেছে তাতে বলা হয়েছে যে, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যারা ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে বা তার আশঙ্কায় দেশত্যাগ করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছেন ২০১৪-র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত, তারা বৈধ ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবেন। এর দ্বারা ১৯৭১-এর পরও বাংলাদেশ থেকে মুসলমান ছাড়া অন্য যেসব ধর্মের মানুষ পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন তাদের সম্মানের সঙ্গে বৈধ নাগরিক হিসাবে ভারতবর্ষে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিলটি এখন সিলেক্ট কমিটিতে রয়েছে। তৃণমূল-সহ কিছু দল এর বিরোধিতাও করছে। কিন্তু আশা করি কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত সংসদে বিলটি পাশ করে আইনে পরিণত করতে পারবে। অসমের ছাত্র সমাজের দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলশ্রুতি অসমের এই নাগরিকপঞ্জি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেও নিজের ও নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার জন্য এই নাগরিকপঞ্জির দাবি জানাতেই হবে। না হলে বাংলাদেশ থেকে এবং মায়ানমার থেকেও (হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বসানো হয়েছে) জলস্রোতের মতো মুসলমান এসে ও ভয়ংকর হারে বংশ বৃদ্ধি করে পশ্চিমবঙ্গের ডেমোগ্রাফিকেই সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেবে।

২। কঠোরভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু :

আমরা জানি যে, মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষত বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী যখন ১-এর বেশি সন্তান নেওয়ার কথা ভাবতেই পারছে না, সেখানে মুসলমান পরিবারগুলিতে ৭-৮টা বাচ্চা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার্থে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা আশু প্রয়োজন। এই জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একটি আদর্শ রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করা হলো—

(ক) কোনও দম্পতিই সর্বাধিক দুইয়ের বেশি সন্তান নিতে পারবে না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যমজ হলে অবশ্য নিয়ম শিথিল করা হবে।

(খ) দুইয়ের বেশি সন্তান হলে আধার, ভোটার, প্যান ও রেশন কার্ড কেড়ে নেওয়া হবে এবং সমস্ত ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে সে বঞ্চিত হবে। সরকারি চাকরি করলে সেটা খোয়াতে হবে।

(গ) তিনের বেশি সন্তান হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই কম করে ১০ বছরের জেল হবে।

এর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য হিন্দুদেরও সচেতন হতে হবে। সব কিছু আইন করে বদলানো সম্ভব নয়। হিন্দু মেয়েদের লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলতে হবে, ঠিক বয়সে বিবাহ করে অন্ততপক্ষে দুটি সন্তান গ্রহণ করতে হবে। এগুলি সবকিছু করা সম্ভবপর হলে বাঙ্গালির শেষ আশ্রয়স্থল পশ্চিমবঙ্গ বাঁচবে— না হলে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমবাংলাদেশ হওয়া এবং বাঙ্গালির পুনরায় উদ্বাস্তু হয়ে ওড়িশা, বিহার বা ঝাড়খণ্ডে আশ্রয় খোঁজা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। ■

শক্তিদাকে যেমন দেখেছি

পবিত্র কুমার ঝা

১৯৭৬ সালের শেষের দিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়র আইন কলেজে ভর্তি হলাম। ৭৬ নং বিধান সরণির একটি বাড়ির পাঁচতলাতে বিদ্যার্থী পরিষদের মেসে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। জরুরি অবস্থার জন্য তখন তিনি কালীদা নামে পরিচিত। রাতে ঘুমানো ব্যবস্থা মেঝেতে শতরঞ্চি পেতে। প্রথম দিন রাতে আমার পাশে শতরঞ্চি পেতে কেউ একজন শুয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে পরিচয় হলো। নাম শক্তিশেখর দাস। বিজয়া ব্যাঙ্কের কর্মী। বউবাজারের ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির পাশের গলিতে একটিমাত্র ঘরে মা, বাবা, এক বোন ও দুই ভাই থাকেন। ফলে শুধু রাতে শক্তিদা এই মেসে ঘুমাতে আসেন। আমাদের সঙ্গে মেসে থাকতেন প্রাক্তন প্রচারক প্রদীপ কুমার ঘোষ, শিক্ষক সত্যদা ও অধ্যাপক গৌরদা। তখন আমার ওপর অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রদেশের অন্যতম সম্পাদকের দায়িত্ব ছিল।

১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে জনতা পার্টির প্রার্থী হিসেবে তখন ড. প্রতাপ চন্দ্র চন্দ দাঁড়িয়েছিলেন। নির্বাচনে জিতে তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর জন্য প্রতিদিন রাতে ওই এলাকায় শক্তিদার নেতৃত্বে বাড়ি বাড়ি প্রচারে বের হতাম। প্রতাপবাবু সেসময় কংগ্রেসি সন্ত্রাসের জন্য স্বয়ংসেবকদের ওপর খুব আস্থাবান ছিলেন। নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন মাঝরাতে ইন্দিরা গান্ধী ও সঞ্জয় গান্ধীর পরাজয়ের খবরে সকলের সঙ্গে শক্তিদার নেতৃত্বে আমরাও আনন্দে মেতে উঠেছিলাম।

সেসময় প্রায়দিন রাতে আমাকে চাকরির আবেদনপত্র লিখতে দেখে শক্তিদা একদিন আমাকে বিজয়া ব্যাঙ্কের জন্য আবেদন করতে বললেন। তাঁর কথামতো আবেদনপত্র জমা দিলাম। ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে বারাণসীতে বিদ্যার্থী পরিষদের অখিল ভারতীয় সম্মেলনের জন্য আমাদের প্রস্তুতি চলছে। কোনো একটা কাজে মালদাতে বাড়ি গিয়ে বিজয়া ব্যাঙ্কের পরীক্ষার চিঠি পেলাম। পরীক্ষা ব্যাঙ্গালোরে। কিন্তু চাকরির পরীক্ষা ও বারাণসীতে অখিল ভারতীয় সম্মেলন একই সময়ে। পরীক্ষা দেব না, সম্মেলনে যাব মনস্থির করে কলকাতা এলাম। সেদিন রাতেই শক্তিদা আমার হাতে ব্যাঙ্গালোরের টিকিট ধরিয়ে দিলেন। আমার আপত্তি টিকল না। বললেন, বারাণসী নয়, আগে ব্যাঙ্গালোরে পরীক্ষা দিতে যাও। লিখিত পরীক্ষার পর মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিলিগুড়িতে চাকরি করতে আসা।

শক্তিদার ইচ্ছে, অনুপ্রেরণা ও নির্দেশে শিলিগুড়িতে চাকরি করতে এসে বিজয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন এবং ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে শুরু করলাম। বিজয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব ভারতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শক্তিদা। সেই সময় মোবাইল ফোন তো দূরের কথা, ল্যান্ডফোনেরও এত চল ছিল না। শক্তিদা চিঠির মাধ্যমেই যোগাযোগ রাখতেন। অজস্র চিঠি লিখতেন। সংগঠন সংক্রান্ত তাঁর লেখা বহু চিঠি আমার কাছে আছে। শক্তিদার প্রেরণা ও সহযোগিতায় শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে আমরা মজদুর সঙ্ঘের একটি প্রাণবন্ত কার্যালয় করেছিলাম। সেই সময় শক্তিদা ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ এবং ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ব্যাঙ্ক অব ওয়ার্কারস্ অনুমোদিত বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ওয়ার্কারস্ অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক ও ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। শক্তিদার শুরু করা বিজয়া ব্যাঙ্কের সংগঠন আজ পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী ও বৃহত্তম সংগঠন।

শক্তিদা স্পষ্টবক্তা ছিলেন। বক্তব্য রাখা, লেখা, আঁকা, কবিতা লেখা, রান্না করা, অভিনয় সব কিছুতেই সমান পারদর্শী ছিলেন। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর সঙ্ঘের কাজের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। গত ১৩ জুলাই কলকাতা গিয়েছিলাম। নাকতলায় আমার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। ফোন করতেই বললেন, জিষ্ণুদা অসুস্থ, তাঁকে দেখতে নার্সিং হোমে যাচ্ছি। আর দেখা হয়নি। খবর পেলাম, ১৪ আগস্ট জাতীয় পতাকা হাতে কলকাতার রানিকুঠি থেকে যাদবপুর পদযাত্রার শেষে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে ১৪ আগস্ট সবাইকে ছেড়ে অমৃতলোকে যাত্রা করলেন। আমার প্রেরণাদাতা ও অভিভাবক এই মহাপ্রাণকে আমার শতকোটি প্রণাম।

শোক সংবাদ

গত ১০ ডিসেম্বর হুগলী জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা হুগলী জেলার পূর্বতন সহ সঙ্ঘচালক ডাঃ বনমালী ভড়ের মাতৃদেবী মনোরমা ভড় বার্ধক্যজনিত কারণে পরলোকগমন করেন। তিনি ৪ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনি-সহ আত্মীয় পরিজনদের রেখে গেছেন। স্থানীয় স্বয়ংসেবকদের কাছে তিনি মাতৃসমা ছিলেন। ■

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জবাব

অর্থের বিনিময়ে নাসিরুদ্দিনের সাম্প্রদায়িক মন্তব্য

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ উপযুক্ত জবাব পেয়ে গেলেন অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ। কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন, 'ছেলে-মেয়েদের কথা ভেবে আমার চিন্তা হয়। কতদিন তারা এদেশে থাকতে পারবে জানি না। কারণ আজকের ভারতে পুলিশ অফিসারের থেকে গোরুর দাম বেশি।' উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে গোহত্যাকে কেন্দ্র করে জনরোষ এবং এক পুলিশ অফিসারের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতেই বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতার এই মন্তব্য। সম্প্রতি বিশ্ব বিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে নাসিরুদ্দিন শাহের মন্তব্যের জবাব দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. সুরেন্দ্র জৈন বলেন, 'নাসিরুদ্দিন শাহ শুধু সিনেমায় অভিনয় করার জন্যেই পারিশ্রমিক পান না, এই ধরনের মন্তব্য করার জন্যেও পান। একটা

জিনিস দিনের আলোর মতো পরিষ্কার, ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের আগে এই ধরনের মন্তব্য আমরা আরও অনেকের মুখে শুনব।' তিনি আরও বলেন, 'একটা সময় ছিল যখন সাহিত্য অ্যাকাডেমির দেওয়া পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। তার পিছনেও ছিল টাকার খেলা।'

ড. জৈন দেশের সুশীল সমাজের একাংশের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে দুর্বল করার এবং গোরক্ষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ যে কোনও হত্যার বিরোধী—তা সে মানুষের হত্যা হোক অথবা গোমাতার। একটি দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর পুলিশের তদন্ত যতদিন না শেষ হয় ততদিন কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো উচিত নয়। নাসিরুদ্দিন শাহের সেই ধৈর্যটুকুও নেই।' গোরক্ষা আন্দোলনের অমর্যাদা করে হিন্দুদের আবেগ নিয়ে খেললে তার ফল ভালো হবে না বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

ড. সুরেন্দ্র জৈন প্রশ্ন তোলেন, 'নাসিরুদ্দিন যখন এতই সংবেদনশীল তাহলে তিনি কেন ১৯৮৪-এর শিখ নিধন নিয়ে কিছু বলেন না? কেনই বা চুপ করে থাকেন ১৯৯০ সালে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নির্বিচার হত্যা প্রসঙ্গে? গোধরায় নারী ও শিশু-সহ ৫৯ জনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। নাসিরুদ্দিন কিন্তু তাদের নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি। নাসিরুদ্দিন কি জানেন মাল্লাপুরমের মতো মুসলমান-অধ্যুষিত শহরে রমজানের সময় হিন্দু ছাত্রদের পায়খানার ভেতর দাঁড় করিয়ে খাবার খেতে বাধ্য করা হয়েছিল? জিহাদিরা যখন অঙ্কিত, চন্দন, প্রশান্ত পূজারি, অরুণ মাহোরের মতো অসংখ্য হিন্দু ছাত্রকে হত্যা করে তখন নাসিরুদ্দিনের টুইটার অ্যাকাউন্ট ঘুমিয়ে পড়ে কেন?' নাসিরুদ্দিনকে তিনি 'সুযোগসন্ধানী' আখ্যা দিয়ে বলেন, 'এরা এখন নানারকম নেতিবাচক প্রচার করবে। চেষ্টা করবে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভেদাভেদ ঘটনোর।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নাসিরুদ্দিনের মন্তব্যে সাধারণ জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। সারা দেশের মানুষ অভিনেতার মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

অটলজীর নামাঙ্কিত একশো টাকার কয়েন উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ীর নামাঙ্কিত একশো টাকার কয়েন প্রকাশ করেছেন। কয়েনের ওজন ৩৫ গ্রাম। এর একদিকে রয়েছে অটলজীর ছবি এবং

দেবনাগরী ও ইংরেজিতে লেখা তাঁর নাম। অন্যদিকে রয়েছে অটলজীর জন্ম ও মৃত্যুর বছর। কয়েনটি ৫০ শতাংশ রুপো, ৪০ শতাংশ তামা, ৫ শতাংশ নিকেল এবং ৫ শতাংশ দস্তা দিয়ে তৈরি। ভারতে প্রচলিত অন্যান্য মুদ্রার মতো অটলজীর নামাঙ্কিত মুদ্রার একদিকে রয়েছে অশোকচক্র। চক্রের নীচে মুদ্রিত 'সত্যমেব জয়তে'। মুদ্রা প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহেশ শর্মা, লোকসভার অধ্যক্ষ সুমিত্রা মহাজান, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় কর্মসমিতির সভাপতি অমিত শাহ্।

ওড়িশার সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্র দায়বদ্ধ : নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ‘ওড়িশার সামগ্রিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার দায়বদ্ধ। রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন থেকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়ন— সব দিকেই যাতে অগ্রগতি ঘটে তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, লক্ষ্যে পৌঁছনোর আগে আমরা থামব না।’ ওড়িশার খুরদা জেলায় আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় সম্প্রতি একথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক দিনের ঠাসা কর্মসূচিতে তিনি নানা প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। তার মধ্যে ভুবনেশ্বরে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি ইএসআইসি হাসপাতাল। এই সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালটি নির্মাণ করতে কেন্দ্রের খরচ হয়েছে ৭৩৫ কোটি টাকা। এছাড়া তিনি ললিতগিরিতে একটি পুরাতাত্ত্বিক জাদুঘরেরও উদ্বোধন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভুবনেশ্বর থেকে ১২০ কিলোমিটার উত্তরে ললিতগিরি ওড়িশার প্রাচীনতম বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত। আরও একটি কারণে ললিতগিরি বিখ্যাত। এই অঞ্চল ছিল ১৮৫৭ সালের মহাসংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। প্রায় দু’শো বছর পর সেই অমর যোদ্ধাদের স্মরণ করে একটি বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদী বলেন, ‘ওড়িশার জন্য কেন্দ্রের উদ্যোগ এক বিশেষ মাত্রায় পৌঁছে গেছে। আমরা জনস্বাস্থ্য এবং জনশিক্ষা— দুটি

বিষয়ের ওপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। এই লক্ষ্যেই ইএসআইসি হাসপাতালের কাজ শেষ করা হয়েছে। এই হাসপাতাল রাজ্যের মানুষকে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আইআইটি ভুবনেশ্বরের ক্যাম্পাসটি ছোটো ছিল। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আমরা এটি বড়ো করে দিয়েছি। মোট খরচ হয়েছে ১২৬০ কোটি টাকা। এখন আর ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক কারও কোনও অসুবিধে হবে না। চাকরির সুযোগও বাড়বে।’ ক্যাম্পাস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক। তিনি বলেন, ‘বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিক্ষেত্রে আইআইটি দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেরা ছাত্র-ছাত্রীরাই এখানে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়। আমার অনুরোধ, আপনারা নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করুন, সেইসঙ্গে দেশ গড়ে তুলতেও সাহায্য করুন। আপনারা ভবিষ্যতে যেখনেই থকুন না কেন ভুবনেশ্বর সবসময় আপনাদের সঙ্গে থাকবে।’

আফগানিস্তানের দুই শীর্ষপদে পাক-বিরোধী নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয়া চমক আফগান-সরকারের। গত ২৩ নভেম্বর পাক সেনা প্রধান ওমর জাভেদ বাজওয়া পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের হয়ে ওকালতি করে বলেছিল ভারত ও আফগানিস্তানের দিকে ‘শান্তি উদ্যোগ’-এর হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে পাক-সরকার, একে পাকিস্তানের দুর্বলতা ভাবা উচিত নয়। ঠিক সেদিনই আফগানিস্তান প্রশাসনের দুই শীর্ষপদে কঠোর পাক-সমালোচককে নিয়োগ করল আফগান সরকার। আফগান প্রেসিডেন্ট আসরাফ ঘানি সেদেশের পরবর্তী গৃহমন্ত্রী হিসেবে আমরুল্লা সালেহ এবং প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী হিসেবে আসাদুল্লা খালেদকে নির্বাচিত করেছেন। এঁরা দু’জনেই এর আগে আফগানিস্তানের গোয়েন্দা-প্রধান পদে ছিলেন এবং ওই পদে থাকবার সময় তালিবানি বাড়বাড়ন্তের জন্য পাকিস্তানকেই দায়ী করেন। পাক মদতে আফগানিস্তানে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে বলেও তাঁরা মন্তব্য করেছিলেন। যাই হোক, আফগান সংসদও এই দুই গোয়েন্দা কর্তার প্রশাসনিক শীর্ষ পদে যোগদানকে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে।

সম্প্রতি আমেরিকার উদ্যোগে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সৌদি আরব, আমিরশাহি, পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে তালিবানের সঙ্গে কথাবার্তা চালু করার চেষ্টা হয়। এরই মাঝে আফগান শীর্ষ নেতার পাক-সমালোচক দুই আমলাকে সেদেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ ওই উদ্যোগকেই প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলেছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, তালিবানদের সঙ্গে কথা চেয়ে আমেরিকা আসলে ‘মুসলিম ব্রাদারহুড’কেই মদত জোগাচ্ছে, দু’যুগ আগে যে ধরনের মদত ‘তালিবানি সন্ত্রাসে’র জন্ম দিয়েছিল। এই পদক্ষেপের জন্যই আগামী বছরের গ্রীষ্মে তালিবান থেকে সাত হাজার মার্কিন সেনা প্রত্যাহারেরও সিদ্ধান্ত নেয় তারা। যদিও ঘরপোড়া গোরু আফগান সরকার সিঁদুরে মেঘ দেখায় পরিস্থিতি এখন অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। জঙ্গি মদতপুষ্ট পাক প্রধানমন্ত্রীর শান্তির হাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত পাক সেনার প্রধান ব্যক্তির তাকে সমর্থন যে জেহাদিদের পরিকল্পনা মাফিকই, আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই সূত্রের মত। আপাতত আমেরিকার ‘শান্তি উদ্যোগ’কে সতর্ক করতেই আফগানিস্তানের দুটি শীর্ষ পদে কট্টর পাক বিরোধীদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন বলে ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত।

ইস্পাত মন্ত্রকের উদ্যোগ 'ইস্পাতে তৈরি—ভারতে তৈরি'

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ২০১৭ সালে ঘোষিত জাতীয় ইস্পাত নীতি এবং দেশে উৎপাদিত লৌহ ইস্পাত পণ্যদ্রব্য সংক্রান্ত নীতি রূপায়ণের ফলে ভারতে ইস্পাতের উৎপাদন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিপুল বৃদ্ধি হয়েছে। ২০১৩-১৪ বর্ষে যেখানে দেশে মাথাপিছু ইস্পাত ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৫৯ কেজি, তা ২০১৭-১৮ বেড়ে ৬৯ কেজি হয়েছে। এছাড়া ২০১৭-১৮ ভারতে ১০ কোটি ৩০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদিত হয়েছে, এবং যার ফলে ভারত ২০১৮ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদক দেশের মর্যাদা পেতে চলেছে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে, ভারতের তৈরি কর এবং স্মার্ট সিটি মিশনের ওপর ভারত সরকারের বিশেষ গুরুত্বের ফলে দেশ জুড়ে ইস্পাতের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরমধ্যে ক্ষুদ্র উৎপাদকরা মধ্য পর্যায়ের ইস্পাত ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশেরও বেশি উৎপাদনের ব্যাপারে অবদান জুগিয়েছে। ফলে এক বিরাট সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

ইস্পাত মন্ত্রক গ্রাম ও শহরঞ্চলে স্বল্প ব্যয়ে আবাসনের নকশা, সেতু, কালভার্ট, অঙ্গনওয়াড়িকেন্দ্র, পঞ্চায়েত হল এবং গোষ্ঠী শৌচাগারের মতো ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করেছে। এছাড়া রেল, সড়ক পরিবহণ, গ্রামোন্নয়ন, পরিবেশ এবং বন ও গ্রাহক সংক্রান্ত দপ্তরের সমস্ত কাজকর্মে ইস্পাতের ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইস্পাত ব্যবহার করে অভিনব পণ্যসামগ্রী তৈরি করার পরিকল্পনা সংক্রান্ত একটি প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। এতে ইস্পাতভিত্তিক ছোটো গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত নকশটি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করেছে।

মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচির আওতায় মূলধনী পণ্যদ্রব্য উৎপাদকদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে মধ্য পর্যায়ক ইস্পাত ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে

যেমন ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে এর ব্যবহারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ বছরের অক্টোবর মাসে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ইস্পাত মন্ত্রকের উদ্যোগে ইস্পাত উৎপাদন এবং মূলধনী পণ্যের বিষয়ে একটি বড়ো সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এছাড়া ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দক্ষতা, নিরাপত্তা বজায় রাখা সহ উদ্ভাবনী প্রযুক্তিতে বর্জ্য পদার্থের ব্যবহার, গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন হ্রাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে মন্ত্রকের পক্ষ থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

এছাড়া দেশে উৎপাদিত লোহা এবং ইস্পাতের পণ্যদ্রব্য সংক্রান্ত নীতিতে আমাদের দেশে ইস্পাত সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়নে পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থানের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে সারা দেশে চারটি আই আইটি-কে ইস্পাত প্রযুক্তির উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। ইস্পাত নির্মিত পণ্যদ্রব্যগুলির গুণমান নিশ্চিত করতে বি আই এস শংসাপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের উন্নয়ন পরিকল্পনা, ইউএনডিপি-র সঙ্গে সহযোগিতায় ইস্পাত মন্ত্রকের উদ্যোগে ভারতের ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রে ইস্পাত উৎপাদনে শক্তি সাশ্রয়, কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কার্বন যৌগের গ্যাস নির্গমন কমানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দেশের ইস্পাত শিল্পের সবচেয়ে বড়ো সরকারি সংগঠন ভারতের ইস্পাত কর্তৃপক্ষ বা 'সেইল'-এর উদ্যোগে দেশের ৫টি বৃহৎ ইস্পাত কারখানা, ভিলাই, বোকারো, রাউরকেল্লা, দুর্গাপুর ও বার্নপুর ছাড়াও তামিলনাড়ুর সালেম ইস্পাত কারখানার আধুনীকিকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এ বছরই ওড়িশার মন্দিরা জলাধারে ১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ইস্পাতের ব্যবহার সংক্রান্ত একটি যৌথ উদ্যোগে সেইল যুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন রেল সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রেও ইস্পাতের ব্যবহার বৃদ্ধিতে, রেলমন্ত্রক, বিভিন্ন রাজ্যসরকার এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের সঙ্গে সেইল একযোগে কাজ করে চলেছে। একইরকমভাবে সেইল-এর রাউরকেল্লা, বোকারে এবং বার্নপুরের ক্ষুদ্র বিমানবন্দরগুলিকে ব্যবহারের জন্য ভারতের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। এ বছরই হিমাচলপ্রদেশের কান্দ্রৌরিতে বছরে ১ লক্ষ মেট্রিকটন টিএমসি বার উৎপাদনের একটি কারখানা চালু হয়েছে। ২০১৮ সালে সেইল-এর মোট মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৮২৯৭ কোটি টাকা। এর আগের বছরের তুলনায় এই পরিমাণ ১৮.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ২০১৮ এই কোম্পানির নগদ মুনাফার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫৮৩ কোটি টাকা। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় ইস্পাত নিগম লিমিটেডের অধীনে ইস্পাত কেন্দ্রগুলি খুব শীঘ্রই বর্ধিত হারে উৎপাদন শুরু করবে। এই দুটি কারখানারই আধুনিকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে ইস্পাত মন্ত্রকের অধীনে ম্যাঙ্গানিজ ওর ইন্ডিয়া লিমিটেড (এমওআইএল) দেশের মিনি রত্নগুলির মধ্যে অন্যতম হিসাবে উৎপাদন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে চলেছে। এই সংস্থার উদ্যোগে ম্যাঙ্গানিজ আকর উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

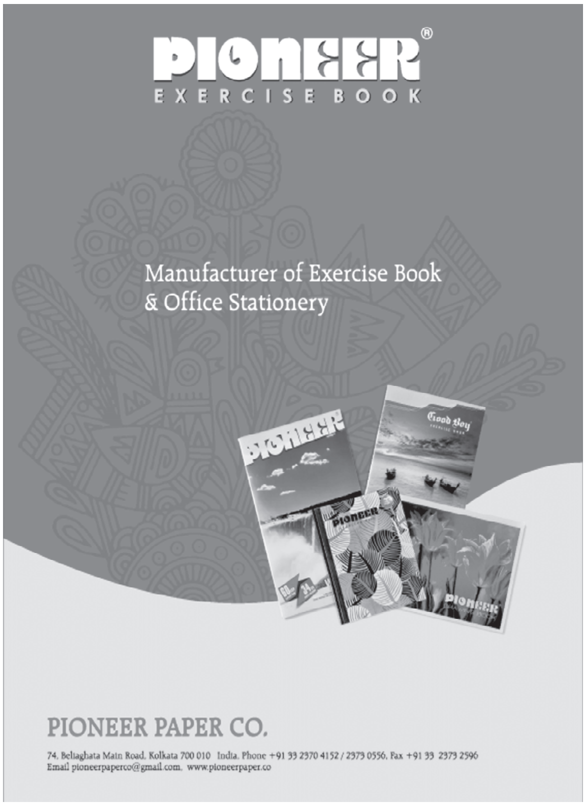

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

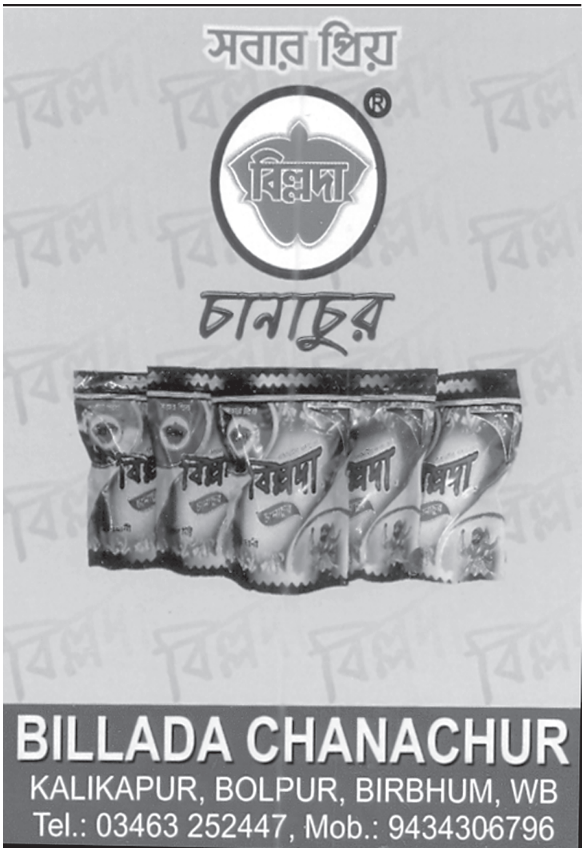

সাপ্তাহিক রাশিফল

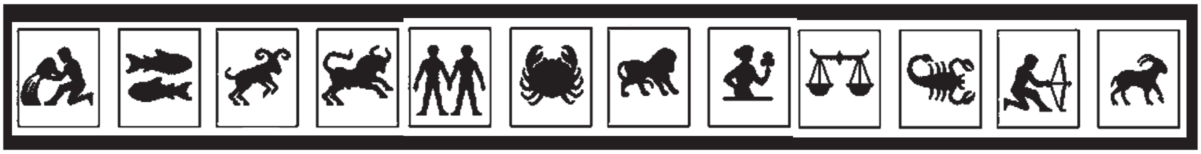

৩১ ডিসেম্বর (সোমবার) থেকে ৬ জানুয়ারি (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, তুলায় শুক্র, বৃশ্চিকে বুধ-বৃহস্পতি, ধনুতে শনি-রবি, মকরে কেতু এবং মীনে মঙ্গল। পুনরায় দুপুর ১১-৫২ মিনিটে বুধের ধনুতে প্রবেশ এবং ওই দিন অপরাহ্ণ ২-১০ মিনিটে বৃশ্চিকে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র তুলায় চিত্রা নক্ষত্র থেকে ধনুতে পূর্বাসাঢ়া নক্ষত্রে।

মেষ : কবি, লেখক, সাংবাদিক, দার্শনিকের সুনাম প্রতিপত্তি ও আশীর্বাদের স্বাভাবিক আগমন। সামাজিক প্রভাব ও উচ্চশিক্ষায় জ্ঞানের প্রসার, স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রয়োজন। নতুন কর্মলাভের সম্ভাবনা তবে জেদ অনেকাংশে ক্ষতির কারণ হতে পারে। গৃহসজ্জা ও বিলাসব্যসনে ব্যয়াধিক্যের যোগ। বয়স্ক মিত্র হিতকারী।

বৃষ : জমি, গাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায় আনুকূল্য ও সাফল্য। প্রিয়জনের সঙ্গে সখ্য ও প্রেম-প্রীতিতে ভরপুর মন। বিদ্যার্থীর পড়াশোনায় একাগ্রতা বা মনঃসংযোগ দরকার। দূর ভ্রমণ ও একাধিক উপায়ে আয়ের সংস্থান। যুবক প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা দরকার।

মিথুন : কথাবার্তা ও রমণীর লুব্ধ দৃষ্টি থেকে সতর্কতা আবশ্যক। স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তায় সন্তান-সন্ততির অ-বিধিপূর্বক আচরণ ও অসৎ-সংসর্গ থেকে মুক্তি ও স্বস্তি। ক্রিয়েটিভ কাজের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি। জনহিতকর কর্মে সুহৃদ সম্পর্ক ও সম্মান বৃদ্ধি। হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি।

কর্কট : উৎসাহ, দৃঢ়তা, বাস্তবতায় কর্মে সফলতা। আত্মীয়দের সহযোগিতা ও সাংসারিক মেলবন্ধন। ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক জটিলতার অবসান। ভ্রাতা-ভগিনীর কর্মজনিত সুখ্যাতি ও প্রশংসা। সর্দি থেকে শরীরের যত্ন নিন।

সিংহ : বস্ত্র, অলংকারে গৃহ সজ্জা বৃদ্ধি, বিবাহ বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সপার্ষদ অংশগ্রহণ। ভৃত্য বিবাদ ও বাসস্থান পরিবর্তনের যোগ। বিদ্যা কর্মে সাফল্য এলেও দৈহিক ও জৈবিক তাড়নায় রমণীর সান্নিধ্য লাভ যা নিন্দা, অপযশ ও সময়ের অপযশ ঘটাবে। ওষুধ ব্যবসায়ী ও কারিগরী বিদ্যায় সংযুক্তদের ধনার্জন বৃদ্ধি।

কন্যা : দৃঢ় মানসিকতায় জীবনচক্র সাবলীল গতিতে সুখী জীবন সাধনায় ধাবিত হলেও সপ্তাহের প্রান্তভাগে সমালোচনা রোগে ক্লেশ ও গবাদি পশুহানির যোগ। আলস্য, অবসাদে সাফল্য করায়ত্ত হয়েও হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যয়াধিক্য ও মানসম্মানের ক্ষেত্রকে শুভ বলা যায় না।

তুলা : বিদ্যার্থী কর্মপ্রার্থীর সাফল্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। বয়স্কদের ক্রনিক রোগ ও সঠিক চিকিৎসায় বিলম্ব। শল্য চিকিৎসক, খনিজ বিজ্ঞানী, শাস্ত্রপণ্ডিতদের বহুমুখী প্রয়াস ও ধনার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি। ভ্রাতা-ভগ্নীর কর্ম ও সাংসারিক সফলতা।

বৃশ্চিক : বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাহিত্য পিপাসুদের বহুমুখী প্রতিভা। আত্মীয়, বন্ধুপ্রীতি, জনহিতে মনোনিবেশ, সৌহার্দ্যমূলক আচরণ ও ভ্রমণের মনস্কামনা পূরণ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে যশ, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, রাজমর্যাদা লাভ হলেও আর্থিক অপ্রতুলতা বজায় থাকবে।

ধনু : উদারতা, সরলতা, শিল্পনিপুণতায় সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ ও মিষ্টতায় প্রতিকূল পরিবেশের অবসান। সুহৃদের সহায়তায় কর্মলাভ। গুরুজনের আশীর্বাদে বিরোধিতা হ্রাস ও নিরানন্দ পরিবেশে জীবনের নতুন উদ্যোগে সাফল্য।

মকর : ক্রীড়াবিদের শরীরের যত্নের প্রয়োজন। নির্মাণ সম্পর্কিত কাজের বাস্তবায়ন। ধর্ম-কর্ম ও রহস্যজনক কজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখবেন। সৎ বুদ্ধির বিকাশ, মনের উদ্দীপনায় অকস্মাৎ জীবনের গতি পরিবর্তন। বিদ্যার্থীর চিন্তা, চেতনায় শিথিলতা। ব্যয় সঙ্কোচে উদাসীন।

কুম্ভ : ক্লেশ, উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা। সতর্কতার সঙ্গে কার্য সমাধা করুন। অবসাদে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা, বিশ্বস্ত সহকর্মী ও মাতুলের সম্পর্কে অর্থনৈতিক প্রাবল্য। সপ্তাহের প্রান্তভাগে প্রতিকূল পরিবেশের অবসান। প্রমোটিং দালালি ও ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা শুভ ইঙ্গিতবাহী।

মীন : অহেতুক সমালোচনা, মূল্যবান দ্রব্যাদি খুঁজে না পাওয়া ও ব্যয়াধিক্য যোগে ভারাক্রান্ত মন, কাজের মধ্যে ব্যাপৃত থাকুন। পারিপার্শ্বিক ও সন্তানের আচরণে কারও সঙ্গে সম্পর্কে চিড়ধরার সম্ভাবনা। সংবেদনশীল মানসিকতায় ভালো বন্ধুর সাহচর্য লাভ।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য